উপন্যাস-মালা।

শ্রীসত্যচরণ মিত্র প্রণীত।

বি কে, দাস কোং
যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কন
স্থল।

কলিকাতা বহুবাজার, শ্রীনাথ দাসের লেন, ১৭ নং ভবনে,
বি কে, দাস এবং কোম্পানির মেসিন যন্ত্রে
শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৯ সাল।

স্ত্রী।

স্ত্রীর নাম করিলে বাঙ্গালী যুবকের মন দুলিয়া পড়ে, প্রাণটা যেন সুগন্ধময় বসন্ত পবনস্পর্শে নৃত্য করে, সমুদয় আত্ম-প্রকৃতিতে যেন কি একটা জ্যোৎস্নার স্রোত ছুটিতে থাকে। নব বিবাহিতের কাণের কাছে গুন্ গুন্ স্বরে স্ত্রীর নাম কর, সে ছাত্র হইলে পড়ার পুঁথি বন্ধ করিয়া, কেরাণী হইলে লেখনীর গতি স্থগিত রাখিয়া, অন্য মনে পৃথিবী হইতে ধীরে ধীরে কি যেন এক স্বপ্নের—ফুলের—সৌরভের—চাঁদের—জোছনার দেশে প্রবেশ করিয়া অজ্ঞাতে দু এক ফোটা চ'খের জল ফেলিবে, বা একটা গভীর ঘনদীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িবে, অথবা এমন একটু সরস—স্ফূর্ত্তিমাখান হাসি হাসিবে—তাহা যেন তাহার অস্থি মজ্জা ভেদ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। যাহার ঘরে কচি গৃহিণীটীকে নব যৌবন তুলি লইয়া শোভার নানা রঙে রঞ্জিত করিতেছে, অধরের হাসিতে, চ'খের জ্যোতিতে, চলনের ভঙ্গিমাতে, লজ্জার শেড্ দিতেছে, এবং হঠাৎ কোন লজ্জার ব্যাঘাত হইলে—কেহ মুখখানি দেখিতে পাইলে বা কথাটী উচ্চস্বরে শুনিতে পাইলে তাহার শাস্তির জন্য মৃদুহাসি—সঞ্চালিত জিহ্বাটীকে মুক্তাদন্তের একটু সামান্য আঘাতে কাটিতে উপদেশ দিতেছে; স্বামী কোন অপ্রিয় কথার আঁচ দেখাইলে, পাশ ফিরিয়া বসিয়া বা শুইয়া পায়ে ধরাইয়া, "দেহি পদপল্লব-মুদারম" এই প্রায়শ্চিত্ত মন্ত্র উচ্চারণ করাইতে শিক্ষা দিতেছে; দুরন্ত স্বামীর নামোল্লেখ করিয়া সহচরিদিগকে পরিহাস করিতে দেখিলে, একটু দূর হইতে ক্ষুদ্র মৃণালহস্তের পদ্মমুষ্টিতে কিল্ উচাইয়া শাসন প্রকোপ প্রদর্শনের অন্তরালে আহ্লাদে ঠোটখানা হইতে উপদেশ দিতেছে;—এরূপ কিশোরী প্রণয়িনীর স্বর্গনিংড়ান নাম, রূপ, ধ্যান ও আলাপ, যুবার জীবনে যে কিরূপ উপভোগ—তৃপ্তি—ও আত্ম বিস্মৃতি,—তাহা যাহার আছে সেই জানে। আর যাহার নাই,—কিন্তু কোকিলের স্বরে, পাপিয়ার শব্দতরঙ্গে, বসন্ত বাতাসের প্রতি হিল্লোলে 'একদিন হবে' এই আশার সংবাদে জীবিত আছে—প্রাণপণে অধ্যয়ন করিতেছে—খাটিতেছে—মনেকত সুখের ঘর কল্পনা ক্ষেত্রে বাধিতেছে—হৃদয়পটে সেক্ষপীয়র কালিদাসকে মাহিনা দিয়া আনাইয়া শকুন্তলা ডেসডিমোনার চিত্র আঁকা-

ইতেছে; এরূপ নবগুম্ফিত নবীন যুবার নিকটে 'স্ত্রীর' নাম দূরস্থিত ইন্দ্রধনুর ন্যায় বিচিত্র সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি।

কেবল বাঙ্গালী স্ত্রীর নামে গলেনা; মানুষ মাত্রেই ওনামে রসে—পাকে—মজে। স্ত্রী, পুরুষের কঠোর জীবনের কোমল কবিতা; জীবন পর্ব্বতে প্রবাহিতা সুস্বাদ সলিলা সুনির্ম্মলা স্রোতস্বতী;—তাহাতে দিবসের সূর্য্যবিদ্ধ আকাশ ও রজনীর চন্দ্র তারকা বিভূষিত নভোমণ্ডল প্রতিবিম্বিত হয়। পুরুষ জীবনের আকাশ সূর্য্য চন্দ্র তারা সব স্ত্রীর হৃদয়ে প্রণয়ে আদরে সেবায় পরিলক্ষিত হয়। পুরুষের যাহা কিছু প্রকৃত তেজ, আশা সৌন্দর্য্য' সব স্ত্রীর স্বচ্ছতায় প্রতিফলিত থাকে। যে স্ত্রীতে স্বচ্ছতা নাই, সে স্ত্রী নহে—রাক্ষসী। যে স্ত্রীতে স্বচ্ছতা আছে; স্বামীর কাছে দর্পণের ন্যায় কার্য্য করে সেই প্রকৃত স্ত্রী—সতী স্ত্রী। যে সৌভাগ্যবশতঃ সতী স্ত্রী পাইয়াছে সে দুঃখের অশ্রুজলসিক্ত উর্ব্বর ক্ষেত্রে সুখের বীজ বপন করিয়াছে। সে মৃত হইলেও জীবিত। ঘোরপাপিষ্ঠ হইলেও স্বর্গাধিপতি। সতী স্ত্রী সুখ সম্ভোগের একটী চিত্র নিম্নে প্রদান করিলাম পাঠকগণ নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিবেন ঃ—

শরৎ বাবু বড় গম্ভীর প্রকৃতির লোক। চিন্তায় সর্ব্বদা দর্শন বিজ্ঞান ফুটিতেছে। এত বৈজ্ঞানিক চিন্তার "একটু পাশে" সাংসারিক ভাবের একটু স্থান আছে। ভাবুক লোকেরা সংসার ক্ষেত্রে বড় দুঃখ পায়—হাট্ বাজারে ঠকে, দেনা পাওনায় লোকের নিকট বঞ্চিত হয়, পনর পয়সার কাচের গ্লাসটীকে পাঁচ টাকায় ভাবিয়া বসে। শরৎ সে প্রকৃতির নহে। দেখিলে লোকটীকে নিরস বোধ হইতে পারে—গাম্ভীর্য্যের ঘন আবরণের জন্য; কিন্তু যে কিছু অধিক মিশিয়াছে সে বুঝিযাছে লোকটীর ভিতরে ভিতরে রসের ফল্গু নদী খরধারে ছুটিতেছে। গম্ভীর প্রকৃতি ভেদ করিয়া যখন মৃদু হাসিটুকু বর্ষাকালের মেঘ ভাঙ্গা রৌদ্রের মত অধরের গায়, চ'খের কোণে ফুটিয়া উঠে, তখন তার মুখের আভা দেখিলে চঞ্চল লোকের মন স্থির হয়—কর্ত্তব্য কাজে আস্থা জন্মে এবং ভাবুকের হৃদয়ে কবিতার পশলা, রৌদ্র মাখান বৃষ্টির পশলার মত ছড়াইয়া পড়ে।

শরতের চিরকালটা গরিব আনা চাল। পায়ে চটি জুতা, তা বিবাহের সভাই বা কি, টাউন হলের বিরাট সভাই বা কি, আর আপনার খোড়ো চণ্ডী-

মণ্ডপেই বা কি, সকল স্থলেই শরতের পায়ে ঠন্‌ঠনের চৌদ্দ আনা কি পনর আনা দামের চটী জুতা,—ধূলায় কাদায় সেই চটী জুতা। একখানা সূতা ধুতী ও মলমলের উড়ানী পরিধান করিয়া হয়তো একটী পুরাণ ছাতা মাথায় দিয়া শরৎ গ্রামে সহরে স্বদেশে বিদেশে, গ্রীষ্মের তাপে পুড়িয়া, বর্ষার বৃষ্টিতে ভিজিয়া ঘরের, পরের কত কাজ করিয়া বেড়াইতেছে। কোথাও যাইতে হইলে সখের জিনিসের মধ্যে এক গাছি বাঘ মুখো বাঁশের লাঠি;—এটী শরতের পিতা ও পিতামহ ব্যবহার করিয়াছিলেন—তেলে ও হাতের ঘর্ষণে লাঠিটী এমনি পালিশ হইয়াছিল যে দেখিলে অনেকের লাঠিটী লইতে ইচ্ছা হইত। শরতের পিতা কখন তামাক খাইতেন না, কিন্তু শাম্বুকের খোলে নস্য ব্যবহার করিতেন—শরৎ তাহা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিত না। খাওয়া দাওয়ার হাঙ্গামা শরতের ছিল না। রোহিৎ মৎস্যের ঝোল দিয়া ভাত খাইতে যেরূপ আনন্দ হইত, আর শুধু লুন জল ও এক খানা লেবুর রস দিয়া একটী মাত্র আলু ভাতের সহিত ভাত খাই-তেও শরতের তদ্রূপ আনন্দ হইত। ঘরে শিকার হাঁড়িতে সন্দেশ গজা থাকিত কিন্তু মুড়ি কলাইভাজা খাইতে শরতের বড় রুচি ছিল। বাটীতে কাহারও ছেলে আসিলে নিজে শিকার হাঁড়ি হইতে সন্দেশ গজা জিলিপি লইয়া তাহাকে খাইতে দিত, দু একখানা বা ঘরে লইয়া যাইতে বলিত। পাড়া গাঁয়ে বাড়ি। কাহারো ঘরে কুটুম্ব আসিয়াছে জানিতে পারিলে, ঘরে মিষ্ট দ্রব্য ফল মূল যাহা কিছু থাকিত, নিজে চাদর বা গামছা ঢাকা দিয়া, শরৎ দিয়া আসিত। পুকুরে মাছ ধরান হইলে, সেখানে যতগুলি ছেলে মেয়ে থাকিত, সকলকে কিছু কিছু না দিয়া মাছ ঘরে আনিত না। বাগানের আম পাড়ান হইলে ভাল গাছ পাকা টুক্‌টুকে আমগুলি আলাদা জমা করিত, পরে গ্রামের ঘর গণণা করিয়া সকলের বাড়িতে কিছু কিছু পাঠাইয়া দিত।

শরৎকে সকলেই সুখ্যাতি করিত। গ্রামের বুড়ার দলে শরতের বড় সুখ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল—তাহারা শরতের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিত। যুবারা শরতের ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। শরৎ যুবা হইলেও যুবার দলে বড় মিশিত না। তার বন্ধু বান্ধব সব বৃদ্ধের দলে। যৌবনের প্রারম্ভ হই-তেই শরতে বিজ্ঞতার সংযোগ হইয়াছিল। শরৎ সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য স্মৃতি ন্যায়, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র, সংহিতা প্রভৃতি রাশি রাশি পুস্তক পাঠ করিয়াছিল।

নিজ যত্নে ইংরাজী শিখিয়াছিল। ইংরাজীতে কৃতবিদ্য হইয়াছিল। বিদ্যার সহিত উপযুক্ত সচ্চরিত্রতার সংযোগ হওয়ায় শরৎ গ্রামটীকে জয় করিয়া বসিয়াছিল। সকল বিষয়ে শরৎ সর্ব্বেসর্ব্বা পরামর্শ দাতা—কর্ত্তা। কাহারও বাটীতে বিবাহ, শরৎ সেখানে কর্ত্তৃত্ব করিতেছে গৃহস্বামীকে আয়োজনের পরামর্শ দিতেছে। কাহারও বাটীতে শ্রাদ্ধের কর্ম্ম—পূজার বন্দোবস্ত সব শরতের সহিত পরামর্শ করিয়া হইতেছে। শরতের সচ্চরিত্রতা ও বিজ্ঞতার কথা গ্রামের সকলেই মাঝে মাঝে কহিয়া থাকে। সচ্চরিত্রতার একটী দীপ্তি শরতে খেলিত—যাহাকে কোন উপদেশ দিত তাহা তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিত—তাহার বিশেষ উপকার হইত। গ্রামে ২।১ জন যে কুলটা ছিল তাহারা অন্যান্য যুবা দেখিলে কত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত কিন্তু শরৎকে একটু দূরে দেখিতে পাইলে বা গলার আওয়াজ শুনিতে পাইলে মুখ হেট করিয়া সরিয়া যাইত। শরৎ সে সব কিছু দেখিত না, সে দিকে দৃষ্টিপাত করিত না। তার সেই যে কেমন গম্ভীর ভাবের দৃষ্টি, চলিবার সময় পায়ের সম্মুখের কিয়দংশ ভূমিতেই বদ্ধ থাকিত।

বাল্যকালেই শরৎ পিতৃ মাতৃহীন হয়। বাটীতে এক বিধবা ভগিনী ছিল সেই শরতের অভিভাবিকা। শরতের বয়স ২৮ বৎসর হইল তখনও বিবাহ হয় নাই। বিবাহে শরতের ইচ্ছা ছিল না। হঠাৎ বড় ভগিনীর মৃত্যু হইল। শরতের মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল। গাম্ভীর্য্য ধৈর্য্য বিজ্ঞতা ভেদ করিয়া শোক শরৎকে কিছুদিনের জন্য কাতর করিয়াছিল। সেই সময়ে গ্রামের অনেকে সর্ব্বদাই শরতের নিকট থাকিত। কেবল রাত্রে শরৎকে একলা থাকিতে হইত। গ্রামস্থ আত্মীয়গণ, শরৎকে বিবাহ করিবার জন্য খুব জোরের সহিত পরামর্শ দিতে লাগিল। শোকের বেগ অপনীত হইলে, শরৎ ও ভাবিয়া দেখিল বিবাহ না করিলে বাটী ঘর সব উৎসন্ন যাইবে, বাগান পুকুর, পিতৃ পিতামহের নাম সব বৃথা হইবে; অতএব বিবাহ করাই যুক্তি সঙ্গত। শরৎ বিবাহ করিবে এই কথা শুনিয়া সকলের আনন্দ হইল। বিবাহের ঘটক ঘটকী আনা গোনা করিতে লাগিল।

আঁটপুরের বৈদ্যনাথ ঘোষালের মেয়ের সহিত সম্বন্ধ স্থির হইল। বৈদ্যনাথের স্ত্রী ও একটী মেয়ে, ও ৫০ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ ছিল।

শরৎ সুশীলা নামে একটী তের বৎসরের স্ত্রী, স্নেহময় শ্বশুর স্নেহময়ী শাশুড়ী পাইল ও পঞ্চাশ হাজার টাকার কাগজ ও অন্যান্য কিছু ভূসম্পত্তির ভাবী অধিকারী হইল। বিবাহের পর, স্ত্রীর সহিত আলাপে, আলিঙ্গনে, চুম্বনে, শরৎ-চরিত্রে একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল;—সেই ভিতরের ফল্গুতে বন্যা আসিয়াছিল;—অভ্যন্তরের রসটুকু বাহিরে ফুটিয়াছিল হাসিতে একটু মধুরতা বাড়িয়াছিল। আর কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই। বেশ ভূষা আহারাদি পূর্ব্বের মত রহিল।

শরতের স্ত্রী সুশীলা, রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। সুশীলা রূপে জ্যোৎস্নাময়ী, কেশে আঁধারময়ী, হাস্যে বিদ্যুৎময়ী। উপরে সুকৃষ্ণ কেশদাম নিম্নে ললিত-লাবণ্য—মাধুর্য্যময়ী দেহ, যেন আঁধার তলে আলোক রাশি ঝুলিতেছে। বাহিরের সৌন্দর্য্য, ভিতরের প্রণয় স্নেহ মমতার কোমল আঘাতে দিন দিন সুগঠিত হইতেছে। হৃদয় নিঃসৃত সরল সরমের হাসি, ওষ্ঠের রক্তিমায় প্রাণের হিল্লোল দেখাইয়া, স্বামীর মৃত প্রাণকে সজীব রাখিবার জন্য সর্ব্বদা নীরবে সঞ্চরণ করিতেছে।

শরতের ঘরে সেই প্রেমমূর্ত্তি দিন দিন শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিল। শরতের হৃদয় প্রাণ অস্থি মজ্জায় সেইরূপ, সেই গুণ, সেই হাসি, সেই প্রণয়—কম্পিত আলিঙ্গন শৈলাঙ্গে সেহলার মত জড়াইতে থাকিল।

হাসিটুকু সুশীলার গোলাপী ঠোঁটে সর্ব্বদা লাগিয়া থাকে। সুশীলার সমুদায় প্রকৃতি আনন্দে আদ্র ও সৌরভময়।

সুশীলার গন্ধে ঝগড়া বিবাদ টিকিতে পারেন না। সুশীলা অনেক সময়ে কৃত্রিম ঝগড়া গড়িতে যায়, কিন্তু হাসির তোড়ে কৃত্রিমতা ভাসিয়া যায়, সরলতা ফুটিয়া পড়ে, এবং সেই কৃত্রিম ঝগড়ায় শরৎ খাঁটী প্রেমটুকুর এমন একটু সৌন্দর্য্য দেখে যাহা মেঘের আড়ালে চন্দ্র করে দেখিতে পাওয়া যায় না।

শরৎ যতক্ষণ ঘরের ভিতরে থাকে ততক্ষণ সুশীলা ছাড়া থাকে না। শরৎ শুইয়া থাকিলে দিবসে সুশীলা পদতলে বসিয়া পদ সেবা করে। শরৎ যখন মেটে ঘরের দাওয়ায় বসিয়া কাজ কর্ম্ম করে, সুশীলা ঘরের কবাটের ধারে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টিতে স্বামীর কার্য্যকলাপ দর্শন করে। কিন্তু যখন স্বামী স্নান করিয়া রান্না ঘরের মেজেতে কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া আহার করিতে বসে

আর সুশীলা অন্ন ব্যঞ্জনে স্বামীকে পরিতুষ্ট করিতে থাকে সেই সময়ের সুখ অপেক্ষা সুশীলা আর কিছু অধিকতর সুখ জানে না। স্বামীর খাইতে একটু ক্লেশের আঁচ বুঝিতে পারিলে সুশীলা দারুণ যাতনায় কাঁদিতে কাঁদিতে আপনাকে শত শত ধিক্কার দিয়া স্বামীর সেই ক্লেশ দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। সেদিন আর সুশীলার খাইয়া বসিয়া সুখ হয় না।

শরৎ সর্ব্বদা বাড়ীতে থাকিত না। ২।৩ মাস অন্তর কলিকাতায় যাইতে হইত। শরতের কলিকাতা যাওয়া সুশীলার পক্ষে বিষম বিপদ। যাইবার ২।৩ দিন পূর্ব্ব হইতেই সুশীলা কাঁদিতে আরম্ভ করিত। কখন শরতের গলা ধরিয়া বুকে চন্দ্রমুখখানি গুঁজিয়া উতপ্ত অশ্রুমোচন করিত, কখন স্বামীর আলিঙ্গন-স্বর্গকে অশ্রুজলে প্লাবিত করিয়া, স্বামীর অস্তিত্বকে প্রেমের অতলতলে ডুবাইয়া দিত, এবং স্বামীর অশ্রুসিক্ত চুম্বনরাশির প্রণয়—ভরে অভিভূতা হইত। বিদেশে যাত্রা করিবার দিন সুশীলার মন একটু স্থিরভাব ধারণ করিত। শরৎ যখন কাপড় চাদর পরিয়া হাতে ব্যাগটী লইত, তখন সুশীলার চক্ষে দু এক ফোটা জল ঝরিত বটে, কিন্তু শরতের গাম্ভীর্য্য পূর্ণ দৃষ্টিতে সুশীলার প্রাণ সবল হইত। কেবল মাত্র সুশীলার দেহখানি শরতের বুকের উপর হেলিলে, শরৎ দুই বাহুতে আলিঙ্গন করিয়া 'আবার শীঘ্র আসিব, বলিয়া একটু মৃদুহাসি' হাসিয়া, মুখচুম্বন করিয়া, সুশীলার মিষ্ট অধর যুগল হইতে দুই একটী অমৃতপূর্ণ চুম্বন আদায় করিয়া লোমাঞ্চিত হইত।

মৃদুমন্দ সুললিত হাসিটুকু যেমন সুশীলা সুন্দরীর অমূল্য স্বর্গীয় অলঙ্কার, পার্ব্বতীয় অরণ্যের ঈষৎ জোছনা—জড়িত গাম্ভীর্য্যটুকু তেমনি শরৎ প্রকৃতির অতুলনীয় সামগ্রী। শরৎ অধিক হাসিতে, শব্দ করিয়া হাসির রোল তুলিতে পারে না, কোন কথার আঘাতে অন্যান্য বন্ধুরা যখন হাসির ঝড়ে উড়িতে থাকে, শরৎ তখন একটুমাত্র মুচকিয়া হাসে। সুশীলা শরৎকে উচ্চ হাসি হাসাইবার জন্য কত প্রয়াস পায়। কখন লাবণ্যময়ী হাত খানি লইয়া স্বামীকে 'কাতু কুতু' দেয়; কখন হটাৎ একটা ভাঙ্গা ধুচুনি আনিয়া শরতের মাথায় দিয়া, "বর আমি তোমার কনে" বলিয়া রহস্য করে; কখন কৃত্রিম অভিমানে 'কৃষ্ণ হে রাধার মান ভঞ্জন কর' বলিয়া স্বামীর পদতলে লুটাইয়া পড়ে। স্বামী স্ত্রীর এই সব লীলা দর্শনে প্রেমের আনন্দ প্রাণে

চাপিয়া, কেবল মাত্র স্ত্রীর সুখ বৃদ্ধির জন্য এবং ভাবে আরও মাতাইবার নিমিত্ত, পর্ব্বত গুহা নিপতিত জ্যোছনা কণা টুকুর মত আপনার হৃদয়ের খাঁটি হাসিটুকু নাড়িতে নাড়িতে সস্নেহে স্ত্রীকে বক্ষে ধরিয়া দু একটী চুম্বন সুশীলার মুখ-জ্যোতিতে মিশাইয়া দিয়া সপ্তম স্বর্গের সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকে।

বিবাহের ৩ বৎসর পরে শরতের শ্বশুর পরলোকগমন করিলেন। ৪ বৎসর পরে শাশুড়িটীও মরিয়া গেলেন। শ্বশুরের যাবতীয় বিষয় শরতের অধিকারে আসিল। পিতৃ মাতৃ বিহীনা হইয়া সুশীলা কিছুকাল মনোকষ্টে ডুবিয়াছিল কিন্তু স্বামীর স্নেহ গুণে সে সব কষ্ট অচিরেই দুরীভূত হইল।

শ্বশুরের টাকা পাইয়া শরৎ কলিকাতায় একটী কাপড়ের দোকান খুলিল। ৪।৫ বৎসরের মধ্যে দোকানটীতে অধিক টাকা লাভ হওয়ায় আর এক খানা চাউলের দোকান খুলিল। কিন্তু এই খানেই শরতের সর্ব্বনাশের সূত্র পাত হইল। দুখানা দোকানের কার্য্যে শরৎ অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল; একটু বিশ্রাম করিবার সময় থাকিল না। এমন সময়ে সুশীলা সুন্দরীর ভয়ানক প্লীহা যকৃৎ উপস্থিত হইল। সেরূপ-জ্যোতি দিন দিন মলিন হইতে লাগিল। অনেক চিকিৎসায় বিশেষ উপকার না হওয়ায়, পরিশেষে জল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য চিকিৎসকদিগের পরামর্শানুসারে মুঙ্গের যাওয়া স্থিরীকৃত হইল।

শরৎ, স্ত্রী সুশীলা ও একটী আত্মিয়া স্ত্রীলোক এবং একটী হিন্দুস্থানী চাকর সঙ্গে লইয়া মুঙ্গেরে যাত্রা করিল। সুশীলার শারীরিক অবস্থা এরূপ শোচনীয় যে শরতের স্ত্রী ছাড়িয়া ব্যবসা দেখা অসম্ভব। শরৎকে সর্ব্বদা মুঙ্গেরে স্ত্রীর নিকট থাকিতে হইল। এই রোগের সময় সুশীলা স্বামীর প্রণয় রস যে কি মধুর ও পবিত্র তাহা সর্ব্বদা অনুভব করিতে করিতে এক এক সময়ে কাঁদিত। সুশীলার কিছুমাত্র ক্লেশ না হয় এজন্য শরৎ প্রাণপণে চেষ্টা করিত। স্ত্রীকে কাছে বসাইয়া কত গল্প বলিত, কত যুদ্ধের কথা রাজা রাণীর চরিত্রের কথা, ধর্ম্মতত্বের মিষ্ট মিষ্ট কথা, শুনাইয়া স্ত্রীকে অন্যমনস্কা রাখিত। এক দিন স্বামী স্ত্রীর মুখ খানি মৃদুস্পর্শে ধরিয়া জিজ্ঞাসিল 'সুশীলা এই ব্যারামে তোমার কিছু ভাল লাগে না নয়?' জিজ্ঞাসা করিয়াই স্বামী কাঁদ কাঁদ হইল। স্ত্রী হাসিয়া বলিল 'না—আমার ব্যারামে তোমায় যত মিষ্ট

লাগিতেছে, সুস্থ অবস্থায় তত মিষ্ট লাগে নাই। এখন আমার এক এক সময় তোমার কাছে বসিয়া, তোমার মুখের দিকে চাহিয়া তোমার কথা শুনিতে শুনিতে মনে হয় এতোবেশ আছি,—ব্যারামে কষ্ট আমার আর কিসের'। এই কথাগুলি বলিয়া আবার সুশীলা কাঁদিতে কাঁদিতে মুখ হেট্ করিয়া বলিল, "কিন্তু আমার জন্য তোমার মনের কষ্টের কথা যখন মনে হয় তখন আর আমি আমাতে থাকিনা।"

সুশীলার ব্যারামে দুই তিন বৎসর কাটিয়া গেল; এই দুই তিন বৎসরের মধ্যে শরতের কলিকাতার ব্যবসা মাটি হইতে থাকিল। হিসাব পত্রের গোলমাল ও কর্ম্মচারিদিগের চৌর্য্যবৃত্তির প্রাবল্য বশতঃ ৫০ হাজার টাকার ব্যবসাটী মাটী হইল। ব্যবসাটী বজায় রাখিবার জন্য একদিন শরৎকে কলিকাতায় আসিতে হইল। প্রথমতঃ কাপড়ের দোকানে প্রবেশ করিয়া দেখিল কাপড় চোপড় দোকানে যাহা আছে তাহা অতি অল্প; ২৫ হাজার টাকার সামগ্রীর স্থলে ২।৩শত টাকার সামগ্রী। কর্ম্মচারী হিসাবের খাতা দেখাইল। ধারে যাহারা জিনিষ লইত তাহারা পলাতক। আর বলিল, আপনি ছিলেন না কাপড় অনেক উই'এ মাটী করিয়াছে। শরতের মাথায় বাজ পড়িল। চাউলের দোকানে গিয়া দেখিল তাহারও অবস্থা শোচনীয়। একজন মুহুরী আছে মাত্র, প্রধান কর্ম্মচারী পলাইয়াছে।

শরৎ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল 'অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।' আমার দুর্বুদ্ধিবশতঃ এই বিষময় ফল ফলিয়াছে; এজন্য আর আক্ষেপ করা বৃথা। এবিপদকে গ্রাহ্য করি না, যদি আমার সুশীলা ভাল হয়। হায়! সুশীলা, কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে কিছুই জানে না। হায়! একে রোগ যন্ত্রণায় অধীরা এদারুণ সংবাদ তাহাকে কোন মুখে কোন প্রাণে বলিব। একথা শুনিলে আর সে বাঁচিবে না। হায় ভগবান! আমার গুণের স্ত্রী সুশীলা যদি বাঁচে, তো আমি গাছতলায় গিয়া সুখী হব, আমার সুশীলাকে প্রাণে মারিও না।

কর্ম্মচারীদিগের দোষে শরতের কেবল মাত্র যে পুঁজির টাকা নষ্ট হইয়াছিল তাহা নহে;—শরৎ ৪।৫ দিন কলিকাতায় থাকিয়াই বুঝিতে পারিল ৬।৭ হাজার টাকা দেনা হইয়াছে। দুই দোকানের জিনিষ পত্র বিক্রয় করিলে ৪।৫ শত টাকার অধিক হইবে না। এই বিপাকে শরৎ ভাবিয়া দেখিল

শ্বশুরের বাড়ী, নিজ বাড়ী, ও ভূসম্পত্তি সমুদয় বিক্রয় করিলে ৬।৭ হাজার টাকা হইতে পারে।

শরৎ মনকে স্থির করিল। ভাবিল, "মানুষের দশ দশা। ভগবান যখন যে দশায় ফেলেন ভালর জন্য। বিষয় সম্পত্তি সমুদয় গেল, কোন ভাবিবার কারণ নাই; এখন সুশীলা যদি বাঁচে।" এই বিপাকে সুশীলার পীড়ার চিন্তাই শরৎকে ক্লেশ দিতে লাগিল। শরৎ সুশীলার প্রতিমূর্ত্তি, সুশীলার ভালবাসা, সেবা, স্নেহ, সমুদয় একদিকে রাখিয়া মনে মনে তৌল করিল। দেখিল সসাগরা পৃথিবীর আধিপত্য পায়ে ঠেলিয়া সুশীলাকে লইয়া গাছতলায় তৃণপত্র ভোজন করিয়া স্বর্গসুখ লাভ করিতে পারি। আবার ভাবিল, "প্রাণেশ্বরী আমার সর্ব্ব-কষ্ট দূর করিয়াছে। আমি অনেক তপস্যার বলে অমন স্ত্রী লাভ করিয়াছি। সুশীলা আমার, আমা বই জানে না। এত রোগে পড়িয়াও, কিসে আমার ভাল খাওয়া হয়, ভাল বিছানাটী হয় তজ্জন্যই সর্ব্বদা ব্যস্ত। কিছার বিষয় সম্পত্তি! যাগ—সব যাগ! কোন দুঃখ নাই! সুশীলা বাঁচুক। ভগবান! সুশীলা যদি বাঁচে তবেই এজীবন রাখিব। নহিলে,"—আর শরৎ ভাবিতে পারিল না। সুশীলা বাঁচিবে না—এভাব মনে আনিতে পারিল না। উপস্থিত বিপদের বিষয় তিলার্দ্ধ চিন্তা না করিয়া, কেবল মাত্র সুশীলার বিবর্ণ দেহ, ও ভীষণ রোগের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে অশ্রু-মোচন করিতে লাগিল।

দোকানের এক ধারে বসিয়া শরৎ নিরবে কাঁদিতেছে, এমন সময় শরতের প্রিয় বন্ধু শশিভূষণ আসিয়া উপস্থিত হইল। শশিভূষণের দিকে চাহিয়া শরৎ অধিকতর দুঃখে অভিভূত হইল। শশী শরতের হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসিল, ব্যাপার কি? তোমার স্ত্রী কেমন আছে?

শরৎ। সেইরূপই আছে।

শশী। অত কাঁদ্‌ছ কেন? হ'য়েছে কি?

শরৎ। সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ।

শশী। কি? ব্যাপার কি?

শরৎ। একেতো স্ত্রীর ব্যারাম, তার উপর ব্যবসা মাটী, তার উপর ৬।৭ হাজার টাকা দেনা।

শশীভূষণ শুনিয়া চমকিত হইল। কিয়ৎক্ষণ নিরবে থাকিল।

পরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিল, কেন এ রকম হ'ল ?

শরৎ। জানতো—স্ত্রীকে লয়ে ২।৩ বৎসর আমি বিদেশে ব্যস্ত। এই সুযোগে কর্ম্মচারীদিগের উৎপাত। জিনিষ পত্র যাহাদিগকে হাওলাত দিয়াছে তাহারা পলাতক। তাদের বাটী, দেশ, কোথায় তার খবর কিছু জানা নাই। বলে অনেক কাপড় ইঁদুরে কাটিয়াছে।

এইরূপে শশিভূষণের সহিত শরচ্চন্দ্রের অনেক কথোপকথন হইতে লাগিল। ৩।৪ ঘন্টা পরে, শরৎ অধোমুখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "কোন কোন পাওনা-দার নালিশ করিয়াছে, অন্যান্য সকলে টাকার জন্য আনাগোনা করিতেছে। বিষয় সম্পত্তি সমুদয় বাস্তভিটা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া টাকা পরিশোধ করিতে হইবেক। এই কথা বলিয়া শরৎ আবার কিয়ৎক্ষণ অধোমুখে থাকিল। আবার ঘাড় তুলিয়া প্রাণেরবেগ প্রাণে চাপিয়া বলিল, "এজন্য আমার ক্লেশ নয়, কিন্তু শশি! এবিপদের কথা সুশীলাকে কি প্রকারে বলিব! একেত রোগে মৃত-প্রায়, একথা শুনিলে সুশীলা আর বাঁচিবে না।"

এই কথা শুনিবামাত্র, শশীর অন্তঃকরণ ভেদিয়া একটী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। শশী কাঁদিয়া ফেলিল। অল্পক্ষণ পরেই আবারএকটু ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া বলিল 'শরৎ তোর ভয় নাই, আমি তোর প্রাণ দিয়া সাহায্য করিব। আর তোর স্ত্রী যেরূপ বুদ্ধিমতী ধৈর্য্যশালিনী, তাতে তোর ভয় নাই। আমার মা ও দিদির মুখে তোর স্ত্রীর যেরূপ গুণের কথা শুনিয়াছি, তাহাতে আমার বেশ মনে হয়, তোর এ বিপদের কথা শুনিলে, তোর দুঃখ দূর করিবার জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে।

শশীভূষণের কথা না ফুরাইতে ফুরাইতে, একজন পত্রবাহক একখানা পত্র শরতের পার কাছে ফেলিয়া দিল। পত্রের উপরে সুশীলার হাতের লেখা। রোগের অবস্থার লেখা বলিয়া অক্ষরগুলি ভাল হয় নাই—নিস্তেজ। কিন্তু পূর্ব্ব পত্র সকলের লেখার অপেক্ষা এবারের লেখায় যেন একটু তেজ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখা দেখিয়া শরৎ একটু যেন আশ্বাসিত ভাবে পত্রখানি খুলিল। হায় ভগবান! যা ভাবিতেছি তাই কি হবে, এই কথা বলিয়া পত্র খুলিয়া পড়িতে লাগিল :—

শ্রীশ্রীহরি। সন ১২৮২সাল
১০ই বৈশাখ।

প্রাণনাথ!

তোমার কয়েকদিন চিঠি না পাইয়া ভাবিত আছি। তুমি যেদিন হইতে, কাছ ছাড়া হইয়াছ, সেই দিন হইতে, তোমার হাতের লেখা পত্রগুলি, ২।৩ বার করিয়া পাঠ করি এবং তাহাতেই সময়টা একপ্রকার সুখে কাটাই। একটা শুভ সংবাদ এই যে, তিন দিন আমাব জ্বর হয় নাই। আহারে রুচি দিন দিন বাড়িতেছে, রাত্রে নিদ্রা মন্দ হয় না। কবিরাজী ঔষধে উপকার হইতেছে। দোকানের সংবাদ কি লিখিবে। একটা দুঃস্বপন দেখিয়াছি, "আমাদের নাকি অনেক টাকা দেনা হইয়াছে।" এতদূর পর্য্যন্ত পড়িয়াই শরৎ অস্থির ভাবে রোদন করিতে লাগিল। শশিভূষণ ভয় পাইল।

বলিল কি? কাঁদছ যে। সুশীলা ভাল তো? শরৎ তখন সাশ্রু-নয়নে শশীর দিকে চাহিয়া বলিল, "ভাইরে! সুশীলা যে দুঃস্বপন দেখিয়াছে তাহা ভাবিয়া আমার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে, আমি কেমন করিয়া লিখিব যে তোমার দুঃস্বপ্ন ঠিক্ হইয়াছে।

শশী বলিল, "সে যাগ, শারীরিক খবর কি?

শরৎ কহিল, "ভাই! ঈশ্বর তত নিষ্ঠুর হন নাই—আহারে রুচি দিন দিন বাড়িতেছে। শশিরে! আমার বিষয় যাগ, ঘর বাড়ী যাগ, সুশীলা যদি বাঁচে, আমি সব সহ্য করিতেপারিব।

শশী। ভয় নাই, সুশীলা ভাল হবে।

শরৎ। তাই বল ভাই—কি জানি বুঝিতেছি না—হয়তো বিপদের উপর বিপদ হবে, হয়তো বিষয় সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে শরৎকে সুশীলা-হারা হয়ে প্রাণত্যাগ কর্ত্তে হবে।

শরতের, অশ্রুজলে বক্ষ ভাসিতে লাগিল, দেখিয়া শশীভূষণ আপনার উত্ত-রীয় দ্বারা শরতের চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, "শরৎ আর কাঁদিসনি"—তুই শীঘ্র এখানকার কার্য্য শেষ করে মুঙ্গের যা। এখন একখানা চিঠি লেখ, এসব কথা এখন খুলিস নি। সময় বুঝে কাছে বসে খুলে বলিস। এই বিপদে, তুই, স্ত্রী যে কি সামগ্রী বুঝিবি। তারপর পত্রে কি লিখেছে পড়। শরৎ

মনটা স্থির করিয়া, সুশীলার মঙ্গল সংবাদে একটু বলিষ্ঠ-প্রাণ হইয়া আবার পত্র পড়িতে লাগিল :—

আমার বোধ হয় দেনা হওয়াই সম্ভব। তুমি আমার ব্যারামে কয়েক বৎসর যেরূপ ব্যস্ত, তাহাতে ব্যবসায় অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা। আর বিপদের সময় বিপদ হওয়াই সম্ভব। যা হয়েছে সেজন্য ভাবিত হইবে না। তুমি কেমন আছ লিখিবে, কলিকাতায় খাওয়া-দাওয়ায় খুব কষ্ট হইতেছে তা বুঝিতেছি। খুব সাবধানে থাকিবে। আসিবার সময় পারতো ২।১খানা ভাল পুস্তক আনিবে। ইতি তোমার

সুশীলা।

পত্র পাঠ সমাপন করিয়া, শরচ্চন্দ্র সুশীলার মঙ্গল সংবাদের ভাবে একটু আনন্দাভিভূত হইল। উপস্থিত বিপদের দংশন-জ্বালা জুড়াইতেছে বোধ হইতে লাগিল। এই ভাবে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল! সুশীলা বাঁচিলে, দারিদ্র্যকে কণ্ঠের হার করিতে পারি। শশীকে সে কথাটী বলিল। শশী শুনিয়া একটু আনন্দের ছায়ায় যেন বিশ্রাম করিতে লাগিল। শশী বলিল, শরৎ! তুই যে এত লেখা পড়া শিখেছিস্ এত ইংরাজী সংস্কৃত উদরস্থ করেছিস, তাহাতে তোর মনে যে রক্ত হয়েছে—তার পরিচয় আমি অনেক বার পেয়েছি। তোর ৫০ হাজার টাকা গেল, ঘর বাড়ী যাবে, এ যে কি ভয়ানক বিপদ—কি ভীষণ সর্ব্বনাশ; অন্যে হলে পাগল হ'তো, না হয় বিষ খেত, বা দেশত্যাগী হয়ে চলে যেত। তুই যে এ হেন বিপদের তুফানকে ফুদিয়া উড়াইয়া বলিতেছিস "সুশীলা বাঁচলে দরিদ্রতাকে কণ্ঠের হার ক'রতে পারি,"—এই কথাটীর ভিতরে তোর শিক্ষার অস্থিমজ্জা পাথরের মত হ'য়ে গিয়েছে দেখে, আমার মনে এই একটা ভাব উঠছে যে, যে প্রকৃত শিক্ষিত—তার কাছে বিপদ বিপদই নহে। তোর মুখে তার উজ্জ্বল প্রমাণ পাচ্ছি। বিপদে যে শিক্ষিতের পরীক্ষা—তাতো বেশ দেখ্‌লাম। ভাই ভগবান তোকে জ্ঞান-সুখে সুখী করেছেন। জ্ঞানে যার সুখ—প্রাণে যার সুখের ফোয়ারা—তার আবার কষ্ট কোথায়?

শশীভূষণ বিপদে শরতের ধৈর্য্য-ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। শশীভূষণের কথা শুনিয়া শরচ্চন্দ্র বলিল, "ভাই শশী, আমি সব সহ্য করিতে পারি—

সহ্য করিতেছি কিন্তু—," বলিয়াই শরৎ নিস্তব্ধ হইল—অন্তর্নিহিত ভীষণ জ্বালাকে চাপিতে লাগিল, নয়নতলে অশ্রুবেগকে সম্বরণ করিল—চক্ষের জল চাপিয়া, তারপর দুঃখ-জড়িত স্বরে বলিল, "কিন্তু যে সুশীলা হাস্য বই জানে না, এমন দারুণ রোগেও যার মুখের হাসিটুকু কমে নাই, যে বলে আমার এই হাসি চিতার আগুণে মিশিবে, সেই সদা হাস্যমুখী প্রফুল্লহৃদয়া সুশীলাকে কি প্রকারে এ নিদারুণ অবস্থার কথা বলিব। আহা! আমি কি প্রকারে সুশীলার চাঁদ মুখের হাসিটুকু কাড়িয়া লইব। আর সুশীলা বাঁচিবে না—এ খবর শুনিলেই প্রাণত্যাগ করিবে। একে স্বভাবতঃ কোমলা, আনন্দে প্রতি-পালিতা, তাহাতে জীর্ণ-কলেবরা; এ সংবাদ তার প্রাণে দারুণ শেলের ন্যায় আঘাত করিবে।"

শশীভূষণ বলিল, "হাঁরে! যার স্ত্রী ভীষণ রোগেও মুখের হাসি বজায় রাখিতে পারিয়াছে—যার স্ত্রী বলে, আমার মুখের হাসি, শ্মশানের আগুণের সহিত মিশিবে; সে স্ত্রীর—এমন বিজ্ঞ স্বামী—এই সামান্য বিপদের কথা তাহাকে শুনাইতে, চিন্তিত—ব্যথিত—ভাব-ভরে অভিভূত শরৎ! আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, এ বিপদের কথা শুনিলে তোর স্ত্রী কাঁদিবে না, হাসিবে—তোর স্ত্রী কখন আপনাকে হতভাগিনী ভাবিবে না, বরং এই বিপদের সময়ে তোর প্রাণে বলসঞ্চয় করিয়া, আপনাকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া বিশ্বাস করিবে। তুই, যে সতীকে পেয়েছিস—সসাগরা পৃথিবীখানা তার পার নখের সমান হয় না। তুই কিছু ভাবিসনি—কিছু ভাবিসনি। আমি তোর সঙ্গে মুঙ্গের যাব সেখানে কিছু দিন থাকব।

কিয়ৎক্ষণ পরে শশীভূষণ কাল আবার দেখা হইবে বলিয়া চলিয়া গেল।

কলিকাতার কার্য্যাদি সমাপন করিয়া শরচ্চন্দ্র দেশে গেল। গিয়া জমী, বাগান, বিক্রয় করিল, আপনার বাস্তুভিটা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া, ৭হাজার টাকা সংগ্রহ করিল। শরৎ ইহাতে কাঁদিল না—ভাবিত হইল না—কর্ত্তব্য কর্ম্ম গম্ভীর ভাবে ধীরে ধীরে সম্পন্ন করিল। দেশের কোন কোন আত্মীয়া রমণী শরতের কাছে বসিয়া ব্যাকুল প্রাণে শরতের ভিটা বিক্রয় দেখিয়া কাঁদিয়া-ছিল। গ্রামের অনেকে শরৎকে ভিটা বিক্রয় করিতে মানা করিয়াছিল, কিন্তু না করিলে ঋণ পরিশোধ হয় না দেখিয়া, শরৎকে ধৈর্য্য ধরিয়া তাহা করিতে

হইল। শরৎ যে দিন বিক্রয়াদি করিয়া গ্রাম পরিত্যাগ করিল—তখন কেবল মাত্র একবার ভিটার দিকে তাকাইয়া 'সুশীলা আর এ ভিটায় তোমার থাকা হবে না' এই বলিয়া দু এক বিন্দু অশ্রুজল ফেলিয়াছিল—সেই অশ্রুজল দেখিয়া অনেকে অজস্র-অশ্রুবিসর্জ্জন করিল। শরৎ কলিকাতা যাত্রা করিল, সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোক রাস্তায় অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়া, অশ্রুজলের সহিত শরৎকে বিদায় দিল। সে দিন গ্রাম শরতের জন্য—সুশীলার জন্য কাঁদিল। সে দিন সকলে গ্রামখানা ফাঁক ফাঁক বোধ করিল।

পাওনাদারদিগের টাকা কড়ি পরিশোধ করিয়া শশীভূষণকে সঙ্গে লইয়া শরৎ মুঙ্গের যাত্রা করিল। মুঙ্গের পঁহুছিল।

মুঙ্গেরের বাটীতেও আর অধিক দিন থাকা সম্ভব নহে। টাকা কড়ি সামান্যই আছে। আর কয়েকদিন পরেই সুশীলাকে লইয়া ভাসিতে হইবে। এই সব ভাবের স্রোতে—ভাসিয়া, শরৎ সুশীলার নিকট উপস্থিত হইল। তখন রাত্রি। সুশীলা প্রাণে প্রাণ পাইল। কিন্তু শরতের মূর্ত্তিতে কি এক অব্যক্ত গুপ্ত-মর্ম্মবেদনা পাঠ করিয়া বিষণ্ণ-চিত্ত হইল।

সুশীলা জিজ্ঞাসিল অমন অমন দেখিতেছি কেন?

শরৎ।—না—কিছু নয়—পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়েছি ব'লে।

সুশীলা। না—আমার প্রাণ যেন কেঁদে কেঁদে উঠছে—সব ভালতো?

শরৎ। কিছু ভয় ভাবনা নাই—এখন খানিক বিশ্রাম করি। বাহিরে শশী এসেছে—একছিলিম্ তামাক দাও, বাহিরে যাই।

একছিলিম্ তামাক ও হুঁকা কলিকা লইয়া শরৎ বাহিরে যাইল। দাসী আসিয়া বলিল, বাবু আমায় দেন, আমি তামাক সাজি। শরৎ, "থাক থাক" বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল॥ শরৎ ও শশীভূষণ বাহিরের ঘরে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিল। শশী জিজ্ঞাসিল 'সব কথা ব'লেছিস? না ব'লে থাকিস বলগে যা।'

শশীর মুখের কথা শুনিয়া শরতের যেন সমুদয় হৃদয়ে সহস্র সর্পদংশনের যাতনা উপস্থিত হইল। শরৎ প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির মত স্থির ভাবে বসিয়া থাকিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কাতরস্বরে বলিল 'তোমায় ঈশ্বরের দিব্য, এ অবস্থায় আর সুশীলার উল্লেখ করিও না। এ দারুণ ঘটনা শুনিলে এখনি হতভাগিনী প্রাণ ত্যাগ করিবে।

শশীভূষণ একটু চমকিত হইয়া বলিল, সেকি! আজ না হয় কালতো শুনিবে। তাকে এখনি বলগে। তাকে না ব'লে কাকে ব'লবে? আমাকে বলবার আগে তাকে জানান উচিত ছিল। আর তুমি কি তাকে লুকায়ে রাখিতে পারিবে? তোমার হাব ভাব দেখে সব ধরিয়া ফেলিবে। তুমিতো জান, সংসারের বিপদে স্ত্রী যতটা মনে সাহস দিতে পারে—স্বামীর মনকে সুস্থ রাখিতে পারে, এমত আর কেহই নহে। তুমি মনে কর, তার বড় কষ্ট হবে, কিন্তু ব'লে একবার দেখ দেখি; তোমার স্ত্রীর ভিতরে যত কিছু সৌন্দর্য্য লুকান আছে, সব এ সময়ে প্রকাশিত হবে।

শরৎ কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "চির কালটা সে হেসে খেলে বেড়য়েছে—কষ্ট কাকে বলে সে জানে না। আমি কেমন করিয়া বলিব, যে তোমার স্বামী পথের ভিখারী হইয়াছে। ভাই! এ দরিদ্রতা সে কি প্রকারে সহ্য করিবে? যাহা কখন শুনে নাই—ভাবে নাই—তাকে আজ তাই ভোগ করিতে হইবে। তাকে যে সকলে ভক্তি শ্রদ্ধা করে—এ দশা দেখিলে যে সকলে তাকে ঘৃণা করিবে। এ কথা শুনিলে তার বুক যে ভেঙ্গে যাবে, হা ভগবান্! তোম মনে কি এই ছিল;—বলিয়া শরৎ একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। দেখিয়া শশীভূষণ বুঝিল, বন্ধুর দুঃখের উচ্ছাস অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। শরৎ স্থির দৃষ্টিতে শশীর দিকে চাহিয়া রহিল। পরিশেষে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, না—না আমি এ কথা বলিতে পারিব না।" অমনি বক্ষঃ বহিয়া বর্ষার ধারার ন্যায় অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

ব্যথিত প্রাণে শশী বলিল, তুমি কি ক'রে এ সব স্ত্রীর কাছ হ'তে গুপ্ত রাখিবে। এ সব তার জানারে দরকার। তোমাকে নিশ্চয়ই এখনকার মত চাল চলিতে হবে। তোমার স্ত্রীকে দু একদিন পরে দরিদ্র বেশ পরাতে হবে; তবে তুমি তাকে সব না ব'লে কি করিবে? প্রণয়ের কোমলতায় থাকিও না—এখন বিপদের সঙ্গে ভীষণ হও।" শুনিতে শুনিতে, শরতের মূর্ত্তির ভিতর দিয়া যন্ত্রণার গরল-স্রোত প্রবাহিত হইল—শরৎ বলিতে পারিল না, চক্ষু মুদিয়া দুঃখের অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া শয়ন করিল। শশীভূষণ একটু নীরবে থাকিয়া, শরতের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, তাতে আর ক্লেশ কি ভাই! তুমিতো চিরকালই বাহ্য সুখকে ঘৃণা করিয়া থাক। তোমার স্ত্রীর

বিষয় আমি যত দূর জানি, তাহাতে বোধ হয়, তাকে লয়ে সুখী হবার জন্য তোমার অট্টালিকার প্রয়োজন নাই। শরৎ বলিল—স্ত্রীকে ল'য়ে আমি পাতার কুটীরে সুখী হ'তে পারি—সুশীলাকে ল'য়ে বনে বনে, শ্মশানে শ্মশানে অনাহারে অনিদ্রায় মহাসুখে থাকিতে পারি।" প্রণয়ের বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া শরৎ এই কথা বলিয়াই, উঠিয়া বসিল। শশীভূষণ দেখিল, শরতের মনে হঠাৎ বলসঞ্চয় হইয়াছে। শশীভূষণ শরতের একটু গা ঘেসিয়া বসিল, হাত ধরিয়া বলিল, "আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তুমি যেমন সুশীলাকে পাতার কুড়েতে লয়ে সুখী হইতে পার, তোমার স্ত্রীও তোমায় লয়ে বনবাসে, এমন কি কারাবাসেও সুখী হইতে পারে। আমার এ কথায় তুমি অবিশ্বাস করিও না। আর তুমি নিশ্চয় জানিবে, এ অবস্থায় সুখী রাখিবার জন্ত তোমার স্ত্রী এত প্রয়াস পাবে, যে সম্পদের সময় তত চেষ্টা, তুমি দেখিতে পাও নাই। ইহাতে সে আপনাকে গরবিনী বোধ করিবে। স্ত্রীর হৃদয়ের প্রেম যে কি মধুর, কি সুশীতল সৌরভ, তাহা স্বামী সম্পদের সময় বুঝিতে পারে না। বিপদের সময় না হইলে, স্ত্রীর অধরের মধুর হাসির মিষ্টতা অনুভূত হয় না, স্ত্রীর সতীত্বের মনোমোহন সঙ্গীতের মধুরতা বুঝা যায় না। বিপদকালে যখন স্বামী চারিদিকে অন্ধকার দর্শন করে—প্রাণ যায় যায় বলিয়া অনুভব করে, তখন স্ত্রী-রত্ন যে কি মহাসামগ্রী—তাহা বুঝা যায়। স্ত্রীর স্নেহ-প্রণয়-দৃষ্টিতে, প্রেম-সম্ভাষণে, অমৃতময় হাস্যে, এবং মিষ্টরোমাঞ্চকারী চুম্বনে, যে কি অপূর্ব্ব অম্লান স্বর্গামৃত লুকান আছে, তাহা, যে বিপদে আকণ্ঠ ডুবিতে ডুবিতে, সম্ভোগ করিয়াছে—সেই বুঝিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বেই শরতের মনে স্বভাবতঃ বল সঞ্চিত হইতেছিল, এখন বন্ধুর উপদেশে সে বল বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত হইল। শরৎ তখনি গিয়া স্ত্রীর কাছে সমুদয় খুলিয়া বলিতে বলিষ্ঠ-হৃদয় হইল।

রাত্রির আহারাদি সম্পন্ন হইলে, শশীভূষণ বাহিরের ঘরে শুইয়া থাকিল। শরচ্চন্দ্র স্ত্রীর ঘরে গমন করিল।

পর দিন প্রাতঃকালে, শরচ্চন্দ্র বাহিরের ঘরে শশীভূষণের সহিত সাক্ষাত করিল। শশীভূষণ গাত্রোত্থান করিয়া বসিল—বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি হল ?

শরৎ। সব বলিয়াছি—

শশী। কি প্রকার দেখিলে ?

শরৎ। স্বর্গের দেবী বলিয়া বোধ হইল। শুনিতে শুনিতে যেন তার একটী প্রাণের ভারী বোঝা নামিয়া গেল। একটা নূতন তেজ তার প্রকৃতিতে ফুটিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে আমার গলা জড়াইয়া বলিল, "তাতে আর ভয় কি ? তাই বুঝি, তখন তোমার মুখে হাসি দেখি নাই—তাই বুঝি মাঝে মাঝে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিতেছিলে ?" বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল—আমার মুখের উপর মুখখানি রাখিল—কিছুক্ষণ নিরবে থাকিল। তার পরে, মুখে চুম্বন দিয়া বলিল 'তা তুমি তখনি বলিলে না কেন ? ভয় কি ? ভাবিও না—তোমার সঙ্গে আমার গাছ তলায় থাকা যা, আর ত্রিতলে বাস করাও তা।" আবার আমার হাতখানি তার মাথার উপরে রাখিয়া বলিল 'বল—তুমি আর এজন্য দুঃখ বোধ করিবে না। বল—আমার মুখের হাসিতে তোমার সকল অবস্থা বজায় দেখিবে।' ভাই রে! একথা শুনিতে শুনিতে আমার প্রকৃতি যেন অবশ হইল—ভাবিলাম, সতী স্ত্রী কি অমূল্য সামগ্রী !

শরৎ আবার বলিল 'ভাই! হতভাগিনীর নিতান্ত দুরদৃষ্ট ; দরিদ্রতার ক্লেশ তো কখনও ভোগ করে নাই—পুস্তকে দরিদ্রতার কথা পড়িয়াছে মাত্র—লোকের মুখে গল্পে শুনিয়াছে মাত্র, কিন্তু যখন দরিদ্রতাকে আলিঙ্গন করিতে হইবে, তখন যে কি দশা হবে তাই ভাবি।

শশীভূষণ বলিল 'এখনও তোর স্ত্রীতে অবিশ্বাস ? যার অমন সতী স্ত্রী, তার আবার কিসের ভয় ? কিসের দুঃখ ? আর যে স্ত্রী এমন সময়ে, অমন রুগ্ন অবস্থায়—অমন ভাব দেখায়, সে স্ত্রীকে লয়ে তুই বাঘ ভালুকের মাঝে যে সুখী হ'তে পারিবি।

শরৎ বলিল 'সব বুঝি—জানি—তবে আমি যে অমন স্ত্রীকে সুখে রাখতে পারলাম না—এই আমার দুঃখ রহিল—মরিলেও এদুঃখ যাবে না। এই রোগের সময়েও ভগবান এমন বিপদ ঘটালেন! হায় হায় সবই অদৃষ্ট !

শশী জিজ্ঞাসিল 'তোমাদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় সম্বন্ধে কিছু স্থির করিয়াছ ?

শরৎ। না—তাহা কিছু করি নাই। সেজন্য ভাবি না—যা হয় হবে। এইরূপে শশীর সহিত অনেক কথা হইতে লাগিল।

শশীভূষণ ২।৩ দিন থাকিয়াই অন্যত্র গমন করিল।

এই বিপৎপাতের জন্য সুশীলার প্রাণে কোন ক্লেশ, দুঃখ—বা বিমর্ষতা কিছুই দেখা গেল না। বরং যত্ন করিয়া প্রাণে বল সঞ্চয় করিতে লাগিল, স্বামীকে নানা কথায় সুখী রাখিবার প্রয়াস পাইতে থাকিল। স্বামীও, স্ত্রীর এই সব ভাবে বিপদকে সৌভাগ্যের মূর্ত্তি ধরিতে দেখিতে লাগিল।

বিপদটী ভয়ানক অন্ধকার হইলেও সুশীলা সে আঁধারে আলোক। শরচ্চন্দ্র দেখিল সুশীলার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। ৫।৬ দিনের মধ্যে সব রোগ কোথায় দূরীভূত হইল—সুশীলা সবলা ও সুস্থা হইল। মুখের হাসি দিন দিন ফুটিতে লাগিল—কথা দিন দিন মধুরতর হইল। এ বিপদে, শরৎ সুশীলার সুরভিময়ী সুশীতল ছায়ায় আপনাকে ভাগ্যবান বোধ করিল।

কয়েক দিন পরে দেশে, কোন আত্মীয় প্রদত্ত একটী বাগান পাইয়া, শরৎ সেই বাগানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া থাকা স্থির করিল। একদিন সুশীলা, আহারের পর, শরতের কাছে বসিয়া বলিল—'তুমি কি মনে করিতেছ তোমায় চাকুরি করিতে দেব ?

শরৎ। তাই হবে

সুশীলা জানিত, শরৎ চাকুরী করাকে কুকুরবৃত্তি অপেক্ষা—নরক যন্ত্রণা অপেক্ষা—ভীষণতর বলিয়া অনুভব করে। তাই স্বামীর কথার উত্তরে বলিল—'না তা হবে না—আমি বাঁচিয়া থাকিতে হবে না। তুমি যেমন স্বাধীন ছিলে আমি তেমনি রাখিব—তুমি অধ্যয়ন, চিন্তা, ঈশ্বর তপস্যা ভাল বাস, তাই করিবে। আর আমি যে উলের কাজ জানি তাহা করিব। ডোমেদের নিকট ধুচুনি, ধামা বুনিতে শিখিব। তাহাতে আমি তোমায় ১০।১২ টাকা দেব। তাহাতে আমাদের চলিবে—তোমাকে চাকুরি করিতে দেব না।

সুশীলা শরতের জন্য ধুচুনি ধামা বুনিতে শিখিতে চাহে, দেখিয়া, শরতের প্রাণের অস্থিগুলা যেন মুচড়াইয়া গেল—দুঃখকে প্রাণে চাপিয়া বলিল 'তাতে কি ? এই যে কত লোক চাকুরি করিতেছে—ওতে আর কষ্ট কি ?

সুশীলা বলিল 'না তা হবে না—স্বাধীনভাবে এক বেলা খাই সে ভাল দাসত্বে ঝাঁটা মারি—চাকুরি আমি করিতে দেব না। তাতে তোমার অসুখ হবে। তুমি যেমন আছ তেমনি থাকিলে আমার সুখ। বিপদে পড়িয়াছি বলিয়া কি তুমি তোমার ঘৃণিত দাসত্বে অবনত হবে—তা হবে না।

অনেক কথোপকথনের পর, দেশের বাগান মধ্যে একখানা কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া থাকা স্থির হইল।

শেষ পরিচ্ছেদ।

চারি মাস পরে, শশীভূষণ বন্ধুর গ্রামে গমন করিল। অনেক অনুসন্ধান করিয়া বাগানে উপস্থিত হইল। প্রান্তরের পাশে একখানি আমের বাগান, সেই বাগানে একটী সামান্য কুটীর—মাটীর দেওয়াল—তালপাতার চাল। শশীভূষণ দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, আগে শরতের এমনি গোয়ালঘর ছিল, সেই গোয়ালঘর আজ শরতের বিলাস ভবন, সকলি অদৃষ্টে ফলে। কিয়দ্দূরে গিয়া দেখিল, কুটীরের দাওয়ায়, একটী অসামান্যরূপা রমণী মাথার কাপড় খুলিয়া বসিয়া আছে, বসিয়া চরকায় সূতা কাটিতেছে, দাওয়ার নিচে ৩টী নূতন ধূচুনী, ২টী বেতের ধামা, আর অনেকগুলি বাঁশের চেয়াড়ি পড়িয়া রহিয়াছে। কুটীরের চারিদিকে রসালতরু। সেখানে লোকজন বড় যায় না। শশীভূষণের জুতার শব্দ শুনিয়া রমণী ব্যস্ত ভাবে মাথায় কাপড় দিল, মুখ ফিরাইয়া ঘোমটার ভিতর হইতে দেখিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। অমনি বন্ধু মহানন্দে বাহিরে আসিয়া শশীর হস্ত ধরিল। বন্ধু বলিল, শশী তুই এসেছিস! আজ আমার বড় আনন্দ। মনে ভেবেছিনু, তুইও বুঝি বিসর্জ্জন করিলি। ভাই! আত্মীয় স্বজন আর সেদিন হইতে কেহ খোজ খবর লয়না, তুমি যে এলে?—কথা শুনিয়া শশী শরতের গলা ধরিয়া কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিল, ভাই! বন্ধুকে কি এসব কথা ব'লে কষ্ট দিতে আছে? শরৎ। আমি কি তোমায় ভুলিতে পারি, বলিয়াই শশীভূষণ কাঁদিয়া ফেলিল। শশীভূষণ কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিল "এসব ধূচুনী-ধামা কে করিল? শরৎ

বলিল" ভাই আমি আর কাঁদি না, অন্যে একথা শুনিলে কাঁদিয়া ফেলিত, কে করেছে কি বুঝতে পারিতেছ না? তুমি যা বলেছিলে তাই ফলেছে। আমি খুব সুখে আছি—সুশীলা আমায় চাকুরি করিতে দেবে না; কি করিব বল?

দুজনে কুটীরে প্রবেশ করিল। সুশীলা একখানি ছেঁড়া মাদুর বাহিরের দাওয়ায় পাতিয়া দিল। শরৎ ব্যথিত স্বরে কহিল, ভাই! আগে কলিকাতার বাটীতে বসিবার জন্য ভাল চেয়ার আসন পেতে, এখন এই ছেঁড়া মাদুরে বস। শশী বিনিত ভাবে, আর্দ্র বচনে বলিল 'হা শরৎ! তোর সঙ্গে কি আমার সে রকম ভাব? না সে রকম বন্ধুত্ব? তুই কি জানিস না, স্ত্রীজাতীর মধ্যে আমার স্ত্রী যেমন ভালবাসার সামগ্রী—পুরুষ জাতীর মধ্যে তুই আমার তেমনি ভালবাসার সামগ্রী।

সুশীলা কুটীরের ভিতরে থাকিল। দুই বন্ধুতে নানা কথোপকথন হইতে লাগিল। অনেক কথার পর শশী জিজ্ঞাসা করিল, শরৎ! তোমার এই জীবনের পরিবর্ত্তনে তোমার স্ত্রীর কি মনে কিছু কষ্ট হয়েছে? শরৎ একটু সুখের—শান্তির—হাসি হাসিয়া বলিল, কষ্ট হওয়া দূরে থাকুক—এ দরিদ্রতায় ওর যত আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি দেখি সম্পদের দিনে তত দেখি নাই। ওর প্রণয়, ওর স্নেহ, ওর যত্ন, আমায় আগেকার অপেক্ষা অধিক সুখী করেছে। আগে ওর মাঝে মাঝে ব্যারাম পীড়া হ'ত; তাতে আমার বড় ক্লেশ হ'ত; কিন্তু ভগবানের কৃপায় আজ কাল ওর আর ব্যারাম নাই। ও যেন আর সে সুশীলা নয়! আমি যদি কখন এই পরিবর্ত্তনের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে বিষণ্ণ হই, তখন ও কাঁদিতে কাঁদিতে বলে "টাকা কড়িতেই বুঝি তোমার সুখ—আমায় বুঝি ভাল লাগে না।" ভাই! আমি যে তখন কত সাহস, কত আনন্দ পাই তা আর কি বলিব! বলিতে কি আগেকার চেয়ে আমরা দুজনে বড় সুখে আছি। ও এখন নিজে রাঁধে, নিজে ক্ষারে কাপড় কাচে, নিজে ধান ভেনে আনে, নিজে গোবর কুড়ায়, গোবর দেয়, নিজে চরকা কেটে সুতা তৈয়ার করে। আমি বাঁস আনিয়া দি—তাহাতে ধূচুনী চুবড়ি তৈয়ার করে, নিজে উলের টুপি মোজা তৈয়ার করে। ওই সব চালাচ্ছে। আমি পড়ি, চিন্তা করি, লিখি। একখানা দর্শনের বই লিখিতেছি।

কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে, সুশীলা ঘরের ভিতর হইতে ১খানি

২০৲ টাকার নোট বাহিরে শরতের কাছে দিল। শরৎ নোট খানি লইয়া বলিল, ভাই! তুমি যে নোট পাঠাইয়াছিলে তা এখন লও—আমাদের যখন প্রয়োজন নাই তখন দরকার কি? ও টাকা তোমার উপকারে লাগিবে। যখন নিতান্ত অচল হবে তখন নাহয় দিও।" শশীভূষণ নোট দেখিয়া বিস্মিত হইল। শশী ম্লান ভাবে বলিল 'আমি যাহা দিয়াছি—লবনা। তোরা আমায় পর ভাবলি' এই কথা বলিয়াই শশী কাঁদ কাঁদ হইল। নোট খানি হাতে লইয়া, ঘরের ভিতরে সুশীলার কাছে দাঁড়াইয়া সিক্ত স্বরে বলিল 'মা আপনি এ রকম করিবেন না। এ টাকা যদি না লন, আমি আর আসিব না, বুঝিব আমাকেও বিষয় সম্পত্তির সহিত পরিত্যাগ করেছেন। আমি আপনার ছেলে, ছেলের দান লউন।

সুশীলা অগত্যা লইল। শশী বাহিরে আসিয়া বসিল।

সতী স্ত্রীকে পর্ণকুটীরে লইয়া শরচ্চন্দ্র যে স্বর্গীয় সুখ সম্ভোগ করিতেছে, সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর, সে সুখের কণামাত্র পাইলে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করে।

প্রেমদা।

ফাল্গুন মাস। বেলা দ্বিপ্রহর। নীলাকাশ গভীর নীলিমায় পরিপূর্ণ। আকাশের একুল ওকুল রৌদ্রপূর্ণ। চারিদিক আম্র মুকুলের গন্ধে ভুরভুর করিতেছে। একটী গণ্ড গ্রামের কায়স্থদিগের বাটীর জানালার কাছে একটী ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কচি যুবতী বসিয়া আছে। গ্রামের রাস্তার ধারেই সেই বাতায়ন। রাস্তার অপর পারে একটী পয়নালা। পয়প্রণালীর দুপাশে দুটী নবীন আম্র বৃক্ষ নূতন মুকুলের ভরে হেলিয়া পড়িয়াছে। তাহাদেরই একটী শাখায়, ঝোঁপের আড়ালে বসিয়া একটী ককিল, আম্রমুকুল গন্ধের নেশায় বিভোর হইয়া কুহু কুহু স্বরে চারিদিকে সুধা বর্ষণ করিয়া যুবতীর প্রাণের প্রণয়তারে ঝঙ্কার তুলিয়া দিতেছে। ফাল্গুনের ঈষদুষ্ণ বায়ু মাঝে মাঝে সেই স্বরে ও ঝঙ্কারে

উন্মত্ত হইয়া গাছের শাখা পল্লব ও পত্র সকলকে নাচাইয়া যুবতীর "অলক রাশিকে আলিঙ্গনে আন্দোলিত করিতেছে।

বসন্তের নবীন শোভাতে প্রাণী মাত্রেরই আনন্দ। সেই আনন্দ যুবতীর দৃষ্টি ফুটিয়া চারিদিকে মধু বর্ষণ করিতেছে। এদিকে যেমন বসন্তের নবীন শোভা; ওদিকে ত্রয়োদশ বর্ষীয়া প্রেমদারও সেইরূপ নবীন রূপের নব প্রস্ফুটিতা, মাধুরী। এদিকে যেমন বসন্তের সুকোমল পুষ্পময় কণ্ঠে ককিলের কুহুস্বর, পাপীয়ায সপ্তম তাল, ভ্রমরের গুণগুণ ধ্বনি; ওদিকে নব যৌবনাগমনে প্রেমদার কোমল কণ্ঠে সেইরূপ মধুর স্বর, ঈষৎ ক্রোধ প্রকাশে সপ্তম তাল এবং অলঙ্কারের আন্দোলনে ভ্রমরনিন্দিত সুমধুর ঠুন্ ঠুন্ রুন্ রুন্ শব্দ।

প্রেমদা জানালায়। প্রেমদার মাথায় সুগভীর কৃষ্ণবর্ণের কবরী—খোলা, যেন শোভা কৃষ্ণ আবরণে কুণ্ডলিত। সুন্দর শাটী পরিধান বস্ত্র। নাকে নোলক ঝলমল করিয়া সেই অপূর্ব্ব মুখের প্রতিমা হৃদয়ে ধরিয়া আনন্দে দুলিয়া দুলিয়া, নাচিতেছে। কপালে গোলাকার ক্ষুদ্রায়তন সূর্য্যকিরণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে—সেই কিরণের অস্ফুট আভা প্রেমদার পাদস্পর্শে বিভোর হইয়া আছে। বসন্তের অতুলনীয়া শোভার ঝোঁপের মধ্যে, পৃথিবীর রসময়ী কবিতা যেন রমণীমূর্ত্তিতে ফুটিবার জন্য সেইখানে বসিয়া আছে।

রমণী-মূর্ত্তি জানালায় বসিয়া কি ভাবিতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে করপুটে গ্রাম্য দেবতার দিকে লক্ষ্য করিয়া প্রণাম করিল। প্রণাম করিতে করিতে প্রার্থনা করিল—কি প্রার্থনা করিল? বোধ হয়, রমণী এই প্রর্থনা করিল 'ঠাকুর যেন আমার ভাল বর হয়। নিরবে এই সুমধুর প্রার্থনা শেষ করিয়া রাস্তার ধারে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, এক পরিশ্রান্ত ক্লান্ত পথিক সেই পথ পার্শ্বে, আম্র বৃক্ষের ছায়ায়, গামছা পাতিয়া উপবেশন করিল। উপবেশন করিয়া আপনার দুঃখ স্মরণে 'হা ভগবান' বলিয়া একটী গভীর মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। বৃক্ষশাখে ককিল সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস শুনিয়াছিল কি না বলিতে পারিনা; কিন্তু সেই পাষাণভেদী নিঃশ্বাস বায়ুর হিল্লোলে আরোহণ করিয়া, আর কোথাও না গিয়া—আকাশে না মিশিয়া—লগ্ন বুঝিয়া প্রেমদার প্রাণে আশ্রয় অন্বেষণে বাধিত হইল—প্রেমদার হৃদয় কবাটের দ্বার ভাঙ্গিয়া প্রাণের মধ্যে এক প্রলয় উপস্থিত

করিল। যেমন আকস্মিক ঘূর্ণিবায়ুর প্রভাবে সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত হয়, সেইরূপ ঐ দীর্ঘ নিঃশ্বাস, প্রেমদার নূতন গোপনীয় প্রেমসরোবরের সমুদয় জল রাশিকে আলোড়িত করিয়া ফেলিল। সেই নিঃশ্বাসের প্রতিধ্বনি স্বরূপ প্রেমদার হৃদয় ভেদিয়া একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিপতিত হইল। প্রেমদা এক নূতন অবস্থায় পড়িল—হঠাৎ কে প্রেমদাকে কাঁদাইল—প্রেমদা মহা বিপদে যেন নিমগ্না হইল। প্রেমদা জানালা হইতে সরিল না। প্রেমদা ভাবিয়াছিল, উঠিয়া যাইবে, কিন্তু পারিল না—উঠিয়া যাওয়া ভাল লাগিল না। সেই খানে বসিয়া প্রাণ ভরিয়া পথিককে দর্শন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে প্রেমদার দু চক্ষু বাহিয়া অশ্রুধারা ঝরিতে থাকিল।

পথিকের শরীর হইতে স্বেদ নির্গত হইতেছে, মুখ খানি শুষ্ক ও মলিন হইয়াছে; দেখিয়া প্রেমদার বাহু উহার অঙ্গে ব্যজন করিতে এবং অঞ্চল দিয়া মুখ মুছাইয়া দিতে ব্যস্ত হইল। কিন্তু রমণীসুলভ লজ্জায় প্রেমদা সেইখানে সেই ভাবেই বন্দিনী থাকিল।

প্রেমদাটার বুদ্ধি সুদ্ধি নাই, কোথাকার কে—এক পথিকের জন্য উন্মাদিনী হইল—গাছের ককিলের মত সেই বসন্তের ককিল এখনি কোথায় চলিয়া যাইবে;—এমন পথিককে—অজ্ঞাত কুলশীলকে—আপনার হৃদয় খুলিয়া দিল।

এদিকে পিতা সম্বন্ধ স্থির করিয়াছে। ১৫ই বৈশাখে বিবাহের দিন স্থির হইয়া গিয়াছে। প্রেমদা তাহা বুঝিল না—ভাবিল না। প্রেমদা বড় বোকা মেয়ে। লোকে জানিলে কত নিন্দা করিবে—পাঁচ জনে ভ্রষ্টা—কুলের কলঙ্কিনী—বলিয়া গালি দিবে—প্রেমদা সে সব বুঝিল না, প্রেমদা বড় বোকা মেয়ে। প্রেমদার মত অনেক নবীনা যুবতী ঐরূপ কত বার কত অজ্ঞাত কুলশীলকে গোপনে গোপনে হৃদয় দান করে—স্বামী বলিয়া ভাবে, কিন্তু তাহারা সেয়ানা মেয়ে—বাপ মা, যাহার সহিত স্থির করে তাহারা মনটী ফিরাইয়া আবার তাহারই উপর ফেলিয়া দেয়, তাহাকে স্ত্রী—স্বামী রূপে গ্রহণ করে।

আচ্ছা প্রেমদা কি তাই করিবে? তাহা যদি করে—লেখক প্রেমদাকে ভ্রষ্টা বলিবে, অসতী বলিয়া গালি দিবে। কিন্তু তাহাতে প্রেমদা পিতা মাতাকে

সুখী করিবে, দেশের লোকের নিকট সতী সাবিত্রী রূপে পরিচিতা হইবে, শ্বশুর কুল সতীত্বালোকে আলোকিত করিবে।

তা বলিলে কি হয়, প্রেমদা বুঝিল না—ভবিষ্যৎ ভাবিল না, পিতা মাতার মানাপমান বিবেচনা করিল না, একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাসের তেজে অভিভূতা হইয়া কোথাকার এক পথিককে প্রাণের স্বামীত্বে বরণ করিল, সেই পথিকের শ্রীচরণে আপনার কুল, মান, অস্থি, মজ্জা, স্বর্গ, নরক, সমুদয় বিসর্জ্জন দিল।

রসালের ছায়ায় বায়ুর হিল্লোলসেবায় পথিকের শ্রান্তিদূর হইল। পথিক এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে জানালার দিকে চাহিয়া ফেলিল। সর্ব্বনাশ! জানালার আড়ালে এক সুশীতলা বিদ্যুৎময়ী প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া চমকিত হইল। সেই রূপরাশি যুবার হৃদয়, প্রাণ, অস্থি, মজ্জা যেন ভেদ করিল। সেই প্রাণরাম রূপজ্যোতিতে যুবার দুঃখের নিবিড় অন্ধকার যেন ক্রমশঃ সরিয়া যাইতে লাগিল। যুবা যে প্রেমদার রূপফাঁদে পা দিয়া সামলাইতে পারে নাই—বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে—তাহা প্রেমদা আদতে বুঝে নাই। যেই প্রেমদা মুখ বাড়াইয়া ধীরে ধীরে দেখিতে যাইবে, অমনি যুবার অমৃতদৃষ্টির সহিত প্রেমদার প্রেমলজ্জাপুষ্ট শুভ দৃষ্টির আলিঙ্গন হইল। সেই আলিঙ্গনে, প্রকৃতি ভেদ করিয়া এক মাধুরী—দুজনকে প্রাণে প্রাণে—হৃদয়ে হৃদয়ে—বিপদে বিপদে—সম্পদে সম্পদে—সুখে দুঃখে মিশাইয়া একত্রে পরিণত করিল। দুই জনের আধ্যাত্মিক বিবাহ হইল।

প্রেমদার একটু লজ্জা হইল—জানালার আড়ালে লুকাইল। সে স্থান ছাড়িতে আর ইচ্ছা নাই। কিন্তু ক্রুরসংসার প্রেমের পথে কাঁটা ছড়াইল। প্রেমদার মা বাড়ীর ভিতর হইতে ডাকিল:—

ও পিসি! পিসি!

পিসির উত্তর নাই। পিসি বোধ হয় শুনিতে পায় নাই। অন্যান্য দিন পিসির মা এক ডাকেই শাড়া পাইত—আজ পাইল না কেন?

মা আবার ডাকিল "পিসি লো—ওলো পিসি!" পিসি এতক্ষণে শুনিল! শাড়া দিতে গিয়া দিতে পারিল না। সে ডাকে পিসি বড় বিরক্ত হইল। পিসি অন্যান্য দিন মা ডাকিলে আনন্দে উত্তর দিত—আজ উত্তর দিতে বড়

বিরক্তি বড় যন্ত্রণা অনুভব করিল। মা এবার উত্তর পাইল না—তখন রাগিয়া বলিল 'ও মুখপুড়ি! বুড়ো মেয়ে এ দুপুর বেলা কোথা?

বলিতে বলিতে মা একবারে বাহিরে আসিল, পিমি আর কি করিবে—আস্তে আস্তে মনে মনে কাঁদিতে কাঁদিতে—মনোক্ষোভে পাঁজরার হাড় ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে মার সঙ্গে বাটীর ভিতর গেল।

পথিক—প্রেমদার ফাঁদে ধরা সেই বসন্তের পক্ষী—গাছ তলায় কিয়ৎক্ষণ বসিয়া ভাবিল, "কি আর করিব? যাহা হউক যে বিপদে প'ড়েছি—ইহা হইতে উদ্ধার তো হইতে হবে। আমিতো প্রাণ দিয়ে বসিলাম—ওকি তা দিয়েছে? যাহা হ'ক, যাই—ঘটনার স্রোত কোন পথে আমায় ফেলবে তা জানি না।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যুবা একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস' ফেলিয়া, সেই সুখের স্বর্গ পরিত্যাগ করিল। এবারকার দীর্ঘ নিঃশ্বাসটী বড় হতভাগা—সেটার আশ্রয় আকাশে জুটিল—তবে যদি পিমী সেখানে আসিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিয়া সেই 'প্রিয়তমের নিশ্বাসটীকে আপনার বক্ষে ধারণ করে তো—দীর্ঘ নিশ্বাস বেচারার মুক্তি লাভ হবে—নতুবা হতভাগাকে অনন্ত আকাশে অনন্ত কাল ঘুরিয়া মরিতে হইবেক।

পিমী বাটীর ভিতরে গমন করিলে, পিমীর মা বলিল 'এত বেলা হ'ল এখনও ভাত খেলি না—তা নাহয় এক দণ্ড যবে ব'স—ওমা তা নয়! আয় ভাত খা।

পিমি বলিল 'না—আমি ভাত খাব না। আমার ক্ষুধা নাই।'

পিমির, মা কহিল 'এই যে এতক্ষণ ভাত হয়নি ব'লে রাগ করে বাহিরে গিয়েছিলি। খিদে নাই কিলো! ভাত খা—আর রঙ্গ করিস নি।'

পিমির আগে খুব ক্ষুধা হইয়াছিল বটে, কিন্তু আর একটী ক্ষুধা আসিয়া সে ক্ষুধাটীকে চাপা দিয়াছে—সে ক্ষুধার জিনিসগুলাকে তিক্ত করিয়া ফেলিয়াছে—পিমির মা তাহা বুঝে নাই। পিমির তাই ভাত খাইতে ইচ্ছা নাই—ইচ্ছা সেই জানালার কাছে সেই প্রকারে বসিয়া থাকে—যুবাকে সেইরূপ দৃষ্টির ডোরে গাঁথিয়া প্রেমের খেলা খেলে।

পিমি বলিল "আচ্ছা ভাত দে—ভাত বাড়—আমি বাইরে থেকে একবার আসি—জানালার কাছে একটী পুতুল ফেলে এসেছি।"

গাছতলায় বলিলেই ঠিক হইত। কিন্তু পিসি সেটা গোপন করিয়া জানালার কাছে এক মিছা পুতুলের কথা বলিল। আম গাছের কাছে সেই সোণার পুতুলটী দেখিবার জন্য পিসি তাড়াতাড়ি বাহিরে জানালার কাছে গেল—গিয়া আস্তে আস্তে দেখিল। দেখিল আম গাছ সেইরূপই আছে—তলার তৃণরাজি রৌদ্র ও ছায়াময়—একটী ছাগল সেই খানে চরিতেছে, কিন্তু তাহা নাই—সে সোণার পুতুলটী কালের স্রোত কোথায় ভাসাইয়াছে। পিসির প্রাণটা মুচড়াইয়া গেল—মুখ বিষাদে আচ্ছন্ন হইল—অজ্ঞাতে অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিল। চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নামিয়া, হঠাৎ বাটীর রাস্তার ধারের দ্বার খুলিল—বাটীর বাহির হইয়া রাস্তায় দাঁড়াইল—এদিকে ওদিকে সজলনেত্রে চাহিল—কিন্তু আকাশ নড়িল না—বিনষ্ট হইল না—গাছটা তার কষ্টে উপিয়া গেল না—ব্রহ্মাণ্ড সে যুবামূর্ত্তিকে দেখাইতে পারিল না।

পিসি কাঁদিতে কাঁদিতে দ্বার বন্ধ করিল—আপনার অঞ্চলে চ'খের জল ভাল করিয়া মুছিয়া মার কাছে গেল।

মা, পিসির মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল 'ওকিলো! চ'খ ছল ছল ক'রছে—মুখ লাল হ'য়েছে কেন? পুতুল বুঝি পাস্‌নি—পুতুলের জন্য এত কান্না কেন? আমি একটা ভাল পুতুল দেবো—বুড়ো মেয়ের এখনও পুতুলের সাধ যায় না! ভাত বেড়েছি ভাত খা—একটা সামান্য জিনিসের জন্য কান্না দেখ না!

পিসি পুতুল বড় ভাল বাসিত—একটী সামান্য পুতুল হারাইলে কাঁদিয়া মরিত।

পিসির মা, পিসিকে ভাত দিল। পিসি আগে এক ঘণ্টা ধরিয়া ভাত খাইত। পিসীর পাতে আগে পিপীলিকা আসিয়া কাঁদিয়া যাইত; আজ কিন্তু পিসি ভাল করিয়া কিছু খাইল না। অল্পক্ষণ পরে উঠিয়া যায়—দেখিয়া, পিসীর মা বলিল, ওলো! আজ তোকে আবার কি রোগে ধরলো? পিসী কিছু বলিল না। ঘাটে হাত ধুতে গেল। পিসী ঘাটে গিয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছে। অন্য দিন ঘাটে গিয়া পিসী শীঘ্র শীঘ্র মুখ হাত ধোয়; আজ জলে হাত ডুবাতে দেরী, হাত ধূতে দেরি, কুলকুচা করিতে দেরি। পিসী অনেকক্ষণ ভাবিতে ভাবিতে হাত ডুবাইল। পিসির হাত ডুবানই

আছে—তার পর কিয়ৎকাল পরে, অয়ে অয়ে পিসীর হাঁত সঞ্চালিত হইল। পিসী ২ বার ভাবে তো ১ বার হাত ধোয়, ২ টা কুলকুচা করে তো ১০টা ভাবে।

পিসী ঘাটে গিয়া এত দেরি করিতেছে, দেখিয়া পিসীর মা বড় বিরক্ত হইয়া দৌড়িয়া ঘাটে গেল। গিয়া দেখে—মেয়ে কি চিন্তায় নিমগ্না! আমাদের দেশে পিতাপুত্রে রসিকতা চলেনা বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে মা ও মেয়েতে একটু আধটু রসিকতা চলিয়া থাকে। ভাইয়ে ভাইয়ে রগড় চলে না, কিন্তু ব'নে ব'নে খুব রগড় চলিয়া থাকে।

মা ঘাটে গিয়া একটু সরস মুখে বলিল, "বলি এত দেরি কেন? ভাবছিস কি?" পিসী কিছু উত্তর দিল না—চুপ করিয়া থাকিল।

মা আবার একটু হাসিতে হাসিতে বলিল, "বলি—বের জন্ত ভাবিস নাকি?"

শুনিবামাত্র পিসী কৃত্রিম ক্রোধে অধীরা হইয়া "মর মর" বলিয়া জল হইতে উপরে উঠিল।

তার পর, পিসী ঘরে আসিল। অন্য দিন পিসী ভাত খাবার পর, আপনি সাজিয়া ৩।৪টা পান খায়, আজ আর পান সাজিল না—খাইল না—একবারে বিছানায় শয়ন করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বসন্তকালে সকলেই প্রফুল্ল; সকলেরই গায়ে একটু না একটু মাস গজাইতেছে—কিন্তু পিসী সদাই নিরানন্দ, দিন দিন রোগা হইয়া যাইতেছে।

এক মাস পরে, পিসীর মা দেখিল, পিসীর বুকের হাড় বাহির হইয়াছে—পেটে মুখে কালশীরা দেখা দিয়াছে।

মা পিসীকে বলিল 'হাঁলো! তুই দিন দিন অমন হচ্ছিস কেন? তোর খাওয়া দাওয়া যে দিন দিন উঠে যাচ্ছে!

বৈশাখ মাসের পয়লা তারিখে পিসীর বাপ, কলিকাতা হইতে বিবাহের জিনিস পত্র সমভিব্যাহারে বাটীতে আসিল। একখানা গোরুর গাড়ী ময়দা,

ঘি, ডাল, তেল, কাপড়, দানসমগ্রী প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হইয়া বাড়ির দায়ের কাছে উপস্থিত হইল। অন্যান্যবার কলিকাতা হইতে জিনিস পত্র আসিলে পিসী আহ্লাদে আটখানা হইত। আজ বিবাহের জিনিস পত্র আসিল ;— কোথায় আমোদে বত্রিশখানা হইবে,—না দুঃখে আধখানা হইয়া গেল। হঠাৎ পিসীর মুখে যেন কালি পড়িল—চোখ যেন ডুবিয়া গেল—পিসী কাঠের পুতুলের মত বসিয়া একদিকে পাগলিনীর মত তাকাইয়া থাকিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, পিসীর গা গরম হইল। কম্প দিয়া জ্বর আসিল। পিসীর জ্বর দেখিয়া মার মনটী বড় খারাপ হইল। স্বামীকে চুপে চুপে বলিল 'তোমার মেয়ে বোধ হয়, আর অধিক দিন বাঁচবেনা ; ওর চেহারা দেখ্‌লে আমার কান্না পায়। ওই দ্যাখগে জ্বরে ধুঁকছে।

বাপ, হাত পা ধুতে ধুতে এই কথা শুনিয়া শঙ্কিত হইল। হাত, পা, মুখ ধুইয়া ঘরের ভিতরে গিয়া বলিলেন,

মা প্রেমদা!

প্রেমদা শাড়া দিল "কেন?

বাপ বলিল 'তোমার জ্বর হ'ল কেন মা?

প্রেমদা কিছুই উত্তর দিল না। লেপের ভিতরে মুখ লুকাইয়া একটু কার বিষয় ভাবিয়া কাঁদিল।

ডাক্তার আনিয়া চিকিৎসা করায়, জ্বর আরাম হইল বটে, কিন্তু, প্রেমদার ভিতরে মহা পীড়া জন্মিয়াছে। প্রেমদার সে সোণার দেহ কালি হইয়া যাইতেছে—তাহার সুখ যেন জনমের মত ইহ লোক হইতে পলাইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে, পিসির গায়ে হলুদের দিন আসিল। পিসির গায়ে হলুদ পড়িল। কাঠের গায়ে হলুদ মাখান যা, আর পিসির গায়ে হলুদ মাখানও তা। গায়ে হলুদের সময়, পিসিকে যে যাহা বলিল, পিসি দায়ে পড়িয়া তাহা করিল।

তার পরেই বিবাহের দিন। রাত্রি ৮টার সময় অনেক ধুম ধাম করিয়া বর আসিল। বাহির বাড়িতে লোকে লোকারণ্য। বিবাহের সভা রাজসভা, বিবাহের বর কিছুক্ষণের জন্য রাজা। কিয়ৎক্ষণ পরেই বিবাহের লগ্ন সময় উপস্থিত। বর উঠিয়া বিবাহের স্থানে গিয়া মুকুট মাথায় দিয়া বসিল। বরের

আজ কত আনন্দ। বিবাহের সময় মানুষের সমুদয় সৌভাগ্যের সম্ভোগ—সে সময়ের মত সুখের সময় মানব জীবনে আর নাই—পৃথিবীতে স্বর্গ-সুখ যদি কিছু থাকে তো সেই বিবাহের সময়ে।

পিসীকে কোলে করিয়া সেই স্থানে আলপোনা দেওয়া পিড়ীর উপরে বসাইল। পিসী সুখের স্থলকে সাক্ষাৎ যমালয় বলিয়া ভাবিতেছে। যদি পিসীকে শ্মশানে পুড়াইতে লইয়া যাওয়া হইত, তো, এত দুঃখিতা কখনই হইত না। পিসীর সম্মুখে বর না যম, আর অন্যান্য লোকেরা যেন যমদূত। পিসীর হাত লইয়া বরের হাতে দেওয়া হইল। অমনি পিসীর হাতের ভিতরের রক্ত স্রোত যেন বন্ধ হইয়া আসিল—হাতটী যেন মড়ার হাতের মত বরের হাতের উপর স্থাপিত হইল। যদি কেহ জোর করিয়া একটী কেউটিয়া সাপের মুখের উপর পিসীর হাত রাখিয়া দিত, তো, পিসীর এত ভয় হইত না। সেই বরের হাতে পিসীর হাত পড়িবা মাত্র যেন পিসী আড়ষ্ট হইল। সেই পুরুষের হস্ত-স্পর্শে যেন পিসির গায়ের রক্তে গরল মিশ্রিত হইল। সর্পদংশনে বিষ-সঞ্চারে হাতের দশা যেরূপ হয়, পিসীর হাতের দশা যেন কতকটা সেইরূপই হইল। অন্যান্য লোকেরা ভাবিতেছে পিসীর বিবাহ হইল, কিন্তু পিসী ভাবিতেছে 'তাহার যমালয়ে শ্রাদ্ধ হইল; ভবিষ্যতে নরকে পড়িতে হইবে তাহারই যোগাড় হইল।'

বিবাহের পর, 'বাসর ঘরে' বর কন্যা যাইতেছে। পিসী একজনের কোলে ছিল, সেই কোলেতেই হঠাৎ মূর্চ্ছিতা হইয়াছে। বাসর ঘরে গিয়া বর বসিল। পিসীকে কোল হইতে নামাইতে যাইবে না দেখিল, পিসী মূর্চ্ছিতা। অনেক যত্নে পিসীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। কিন্তু আবার কিছুক্ষণ পরেই মূর্চ্ছা হইল।

পিসীর মা, কি কুক্ষণেই বিবাহ হইল—বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সেই রাত্রেই ডাক্তর আনা হইল। ডাক্তর বলিল 'এ গোলমালে রাখা হবে না—অন্যস্থলে—ওর মার কাছে থাকিতে দাও।'

পিসীর প্রাণে একটু যেন বাতাস লাগিল। পিসী মার কাছে অন্য ঘরে, গিয়া শয়ন করিল। মার কাছে পিসির মূর্চ্ছা একবারও হইল না।

পিসীর মা বিছানায় চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিল 'মা! তুমি অমন হ'লে কেন? বিবাহের সময় মা! ও রকম হলি কেন? বর কি মনে ধরে নি?

পিমী কিছু বলিল না, কেবল নিরবে কাঁদিতে লাগিল। আলো জলিতে-ছিল—পিমির মা দেখিতে পাইল দুই চক্ষের জলে বালিশ ভিজিয়া গিয়াছে। তখন মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল 'হ্যা পিমি! আমার আজ কোথা সুখের দিন—তোর বিয়ে দেখে আমার কোথা সুখ হবে—না তোর এ সব দেখে আমার আর বাঁচ্‌তে ইচ্ছা করে না। মা! তুই আমার একটী মেয়ে। আমার আর নাই—এমন দিনে কি তোর অমন ধারা করা ভাল।'

এই সব কথা শুনিতে শুনিতে পিমী চখ কপালে তুলিল—পিমীর দাঁতে দাঁত বসিয়া গেল। 'ওগো আমার সর্ব্বনাশ হ'ল গো—পিমী আমার কোথায় গেল গো' বলিয়া পিমীর মা ঘরের ভিতরে চীৎকার করিয়া উঠিল। বাহির হইতে পিমীর বাপ, বাস ঘর হইতে অন্যান্য লোকেরা, কি হ'ল কি হ'ল, বলিয়া সেই ঘরে গিয়া উপস্থিত হই'ল। ডাক্তর আসিল। ঔষধ দ্বারা পিমীর মুর্চ্ছা ভাঙ্গিল।

পিমীর বাপ, এতক্ষণ পরে মনের দুঃখে কাঁদিতে লাগিল।

রাত্রি পোহাইল। বর, বাসঘর হইতে বাহিরে গেল। বরের মনেও সুখ নাই। একজন বন্ধুকে বর চুপে চুপে বলিল 'ভাই! গতিক ভাল নয়।'

কিছুক্ষণ পরেই পিমীকে বরের পাল্কিতে বরের বাড়ীতে যাইতে হইবে। পিমীর সেই দারুণ সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। পিমীকে যমালয়ে পাঠাইবার যোগাড় হইতেছে দেখিয়া পিমী আবার মুর্চ্ছিতা হইল। এবারে মুর্চ্ছার বেগ অতি ভয়ানক। সে বেগে পিমী এত দুর্ব্বল হইল যে, আর কথা কহিতে পারিল না। পিমী বিছানায় শুইয়া থাকিল। ডাক্তর আসিয়া বলিল, 'এরূপ অবস্থায় প্রেমদাকে শ্বশুর বাড়ি পাঠান যাইতে পারে না। ধাত্‌ যেরূপ দুর্ব্বল হই-য়াছে—আর ২।৩ বার যদি মুর্চ্ছা হয়—তো প্রাণের আশা ত্যাগ করিতে হইবে।'

এই কথা শুনিয়া প্রেমদার প্রাণে প্রাণ আসিল।

বর যাত্রী সকলে চলিয়া গেল। বর, বরের বাপ, আর দুই একজন থাকিল। কিন্তু প্রেমদার মুর্চ্ছা সেদিন নিবৃত্ত হইল না। দুই দিন পরে বর ও অন্যান্য সকলে চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বর চলিয়া গেল। প্রেমদা একটু আনন্দিতা হইল। প্রেমদার মুখ পূর্ব্বের অপেক্ষা একটু সবল হইল। দিন দিন মূর্চ্ছা কমিতে লাগিল। ১০।১২ দিন পরে প্রেমদা একটু আরোগ্য লাভ করিল।

১৩ দিনের দিন, প্রেমদার শ্বশুর আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রেমদা শুনিল—শুনিবামাত্র মূর্চ্ছিতা। মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইবার পর প্রেমদা মাকে বলিল "মা! তুমি কি আমায় চাও? প্রেমদার মা কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল 'অমন কথা কি ব'লতে' আছে মা। তুই যে আমার একমাত্র ধন।'

প্রেমদা বলিল 'মা! তবে একটী কথা বলি। তুমি যদি একথা না শুন, তবে আমার প্রাণের আশা পরিত্যাগ কর।' মা বলিল 'তুমি যা ব'লবে তাই শুনব। তা হ'লে কি তোমার মূর্চ্ছা ভাল হবে?

প্রেমদা বলিল 'আমি আমার শ্বশুর বাড়ি যাইব না। যাহার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছ, তার কথা আমার কাছে খবরদার কেহ বলিবে না। আর আমার শ্বশুর বাড়ির কোন লোক যেন আমাদের বাটীতে না আসে।' যদি এই কথা মাপিক তুমি কাজ না কর, তো আমি শীঘ্রই মরিব।

প্রেমদার মা বলিল 'প্রেমদা! তুমি যে আমার লক্ষ্মী মেয়ে মা! পাড়ার লোক যে তোমার কত প্রশংসা করে। ছি মা ছি! জন্ম জন্ম হাতে লোহা নিয়ে সেই ঘর কর। ও সব কথা কি ব'লতে আছে।

প্রেমদা আর কিছু বলিল না; ঘাড় হেট্ করিয়া বসিয়া রহিল।

প্রেমদার মা স্বামীকে সব কথা বলিল। প্রেমদার বাপ শুনিয়া বলিল 'তাইতো গা! আমার কপালটা নেহাত মন্দ। অমন পাত্র—৪টী পাশ করা; আজকের বাজারে ৮।১০ হাজার টাকা খরচ ক'রে পাওয়া যায় না। হা ভগবান! হতভাগীর কপাল নেহাত মন্দ দেখ্‌ছি। যা হয় তুমি করগে—আমি দেশ ত্যাগী হয়ে যাই। এ সব কথা আর কাকেও ব'ল না। তা হলে আর আমার মুখ দেখাবার যো থাকবে না। লোকে এক ঘরে ক'রবে।" এই কথা বলিয়া কিয়ৎক্ষণ ভ্রুকুঞ্চিৎ করিয়া ভাবিয়া বলিল 'তা এখন তুমি ওকে তাই বলগে যাও। তারপর একটু আরাম হলে, গায়ে বল পেলে, আমরা দুজনে সঙ্গে

ক'রে ওর শ্বশুর বাড়িতে রেখে আস্‌ব। না হয় আমরাও বেই বাড়িতে কিছু দিন থাক'ব। তুমিই তো আদর দিয়ে দিয়ে ওর মাথা খেয়েছ। এমন ক'রেছ যে একদিন তোমাকে ছেড়ে থাকতে চায় না। ওর ব্যারাম ট্যারাম যে কেন তা বেশ বুঝেছি—ওকে এমনি মা যেসা ক'রেছ যে, ওর আখের একবারে খেয়ে দিয়েছ।

প্রেমদার শ্বশুর সেদিন সন্ধ্যাকালে চলিয়া গেল। প্রেমদার মা, মেয়েকে বলিল 'আচ্ছা তোর আর শ্বশুর বাড়ি যেতে হবে না। তাদের আর কি বল; তাদের ছেলের আবার তারা বে দেবে—ভুগ্‌তে হবে আমাদের—তা যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এদিকে প্রেমদার শ্বশুর শ্বাশুড়ি সকলেই রাগিয়া উঠিতেছে। বরের নাম হরিদাস। হরিদাসের আবার বিবাহ দিবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। ইহাতে হরিদাসের বাপ মার বড়ই আনন্দ—কেন না একবার বিবাহে প্রায় তিন হাজার টাকা মারিযাছিলেন। আবার ৩ হাজার নাই হ'ক, হাজার টাকাও তো মারিবেন।

হরিদাস ও বিবাহ করিবার জন্য ব্যগ্র হইল। হরির বাপ, বেইকে এক-খানি পত্র লিখিয়া লোক পাঠাইলেন। পত্রবাহক পত্র লইয়া প্রেমদার বাপকে দিল। প্রেমদার বাপের নাম প্রাণকৃষ্ণ। প্রাণকৃষ্ণ পত্র পড়িতেছেনঃ—

শ্রীশ্রীহরি।

পুত্রের বিবাহ দিয়া কোথায় সুখী হইব, না দিন দিন দুঃখই বাড়িতেছে। বউ বেটা লইয়া আমোদ আহ্লাদ করা আমাদের অদৃষ্টে ঘটিতেছে না। যাহা হউক, অধিক লেখা বাহুল্য। যদি আমাদের সহিত সম্পর্ক রাখা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন, তো বধূমাতাকে শীঘ্র পাঠাইবেন। পরস্য তারিখে উত্তম দিন আছে। উক্ত দিনে পাঠান যদি মত হয়তো, এই লোক মারফৎ

খবর পাঠাবেন। আমরা উক্ত তারিখে পাল্কি পাঠাইব। আর যদি একান্ত না পাঠান, তো, আমরা আমাদের ছেলের আবার বিবাহ দিব—ইহা নিশ্চয় জানিবেন।

পত্র পাঠ করিয়া প্রাণকৃষ্ণ বাবু স্তম্ভিত হইলেন। মুখখানিকে বিবর্ণ করিয়া স্ত্রীকে চুপে চুপে ডাকিয়া সব বলিলেন। স্ত্রী বলিল, "তা কি ক'রবো আর? মেয়ের সুখের জন্যই বিবাহ। তা যদি মেয়ের দুঃখই হয়, তো এসব সম্পর্কে আর দরকার কি? মেয়ের যে প্রকার ধরণ ধারণ দেখছি, সেখানকার কথা শুনলেই তার জ্বর হবে, না হয় মুর্চ্ছা হবে। আমার মেয়ে আগে, না জামাই আগে? মেয়ে বাঁচলেতো জামাই।

প্রাণকৃষ্ণ বাবু, চক্ষু রাঙাইয়া বলিল 'তোমার আদুরে মেয়েকে লয়ে থাক, আমি টুকনি ল'য়ে দেশত্যাগী হই—আমার মান সম্ভ্রম যে সব গেল।' স্ত্রী রাগিয়া বলিল' 'তোমার মেয়েব চেয়ে তোমার মানটী বড় হ'ল কি? যাও তোমাব মান ল'য়ে ধুয়ে ধু'য় খাওগে।'

প্রাণকৃষ্ণ আর কিছু না বলিয়া, রাগে দুঃখে ফুলিতে ফুলিতে, বাহিরে গিয়া পত্রেব এই উত্তর দিল, "পরশ্য তারিখে আপনাদের পাল্কি পাঠাইতে হইবে না। আমি স্বয়ং আমার কন্যাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।"

পরশ্য তারিখ আসিল। তারকেশ্বরে যাবার নাম করিয়া, প্রাণকৃষ্ণ বাবু আপনার মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি রাখিয়া আসিবে, ইহা স্থির করিল। একখানি পাল্কি আনাইল। মেয়ে পূর্ব্বে সমুদয় টের পাইয়াছিল। প্রেমদা বুঝিল, তাহাকে আবার সেই যমালয়ে লইয়া যাইবার যোগাড় হইতেছে। প্রেমদার মার প্যাটরায়, কাগজে মোড়া সাপের বিষ ছিল। সেই সময়ে তাহা মনে পড়িল। প্যাটরা হইতে অন্যান্য জিনিস বাহিব করিবার সময় মার অজ্ঞাত-সারে সেই বিষ মোড়াটী প্রেমদা হাত-গত কবিল।

বাপের সহিত পাল্কিতে উঠিবার সময়, প্রেমদা সাবধানে আপনার বাক্সের ভিতরে বিষের মোড়া রাখিল। প্রেমদা ভাবিয়া স্থির করিয়াছে—যখন বেগতিক দেখিব, তখনই এই বিষ খাইব—আমার সতীত্বকে কলঙ্কিত করে কাহার সাধ্য?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রেমদার খাশুড়ি, প্রেমদাকে রাত্রে হরিদাসের ঘরে রাখিয়া গেল। প্রেমদা বিষের মোড়াটী পেট কাপড়ে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। প্রেমদা প্রথমে বিছানায় শুইয়া ছিল। হরিদাস ঘরে প্রবেশ করিয়া, খিল দিবা মাত্র, প্রেমদা বিছানা হইতে উঠিয়া, ঘরের এক কোণে গিয়া দাঁড়াইল। পেট কাপড় হইতে বিষ বাহির করিল।

হরিদাস আনন্দের ভরে আপনার শয্যাব উপরে বসিল। শয্যা'য অনেক গুলি ফুল ছিল। একটী ফুটন্ত গোলাপ লইয়া, প্রেমদাকে ছুঁড়িয়া মারিল। প্রেমদা তখন ভাবিতেছে, "কি করিব ?" সেই পথিকেব প্রাণারাম মূর্ত্তির ধ্যান কবিতে লাগিল। সেই মূর্ত্তির ধ্যানে, প্রেমদার লজ্জা পলায়ন করিয়া হৃদয়ে সাহসের সঞ্চার হইল। প্রেমদা ভাবিল, "বিষ খাইব কেন ? আমার প্রাণেশ্বরকে না দেখিয়া মরিব কেন ? এ লোকের কোন দোষ নাই। এই যুবা আমাকে উহার স্ত্রী বলিয়া ভাবিয়াছে, কিন্তু আমি সেই তাঁর স্ত্রী—তিনি ভিন্ন আমায় কেহ স্ত্রীভাবে স্পর্শ করিতে পরিবে না।"

যুবা আবার একটী ফুল ছুঁড়িয়া মারিল। তখন প্রেমদা কম্পিতস্বরে ঘাড় হেট্ করিয়া, কবাটের কাছে আসিয়া, খিলটী খুলিয়া রাখিয়া বলিল, "আপনি আমার আশা ত্যাগ করুন, আমায় স্পর্শ করিবেন না—আপনি যদি আমায় স্পর্শ করেন তো—এই বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিব।"

যুবা চমকিত হইয়া বলিল, 'কি কি?' বলিতে বলিতে হঠাৎ নিকটে আসিয়া প্রেমদার হাত ধরিল। প্রেমদা বেগে হাত ছিনাইয়া লইল—বলিল 'আমি আপনার স্ত্রী নহি—আমার স্বামী একজন আছেন'—এই বিদ্যুৎপূর্ণ কথায় যুবার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। 'পাপিয়সী। তোর এখনি মুণ্ডপাত করিব,' বলিয়া সেই ঘরের দেয়াল হইতে তরবার আনিতে উদ্যত হইল। প্রেমদা দ্বার খুলিল; খুলিয়া ছুটিতে লাগিল। বাটির অন্যান্য লোকেরা সেই চীৎকারে জাগ্রত হইয়া, সেই ঘরে আসিয়া দেখিল 'হরিদাস তরবার হস্তে ক্রোধে থর থর কাঁপিতেছে'।

সকলে সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া অবাক হইল। প্রেমদাকে সকলেই খুঁজিল

কেহ আর পাইল না। প্রেমদার বাপ কাঁদিতে কাঁদিতে লজ্জায় দুঃখে, তাহাদের বাটী সেই রাত্রেই পরিত্যাগ করিল।

সেই বাড়ি হইতে প্রাণকৃষ্ণ বাবুর বাটী পাঁচ ক্রোশ দূরে। প্রাণকৃষ্ণ, সেই বাড়ি হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে গিয়া দেখিলেন, রাস্তার ধারে গাছতলায় কে একজন বসিয়া আছে। সে প্রেমদা—বাবাকে দেখিয়া প্রেমদার একটু সাহস হইল। প্রেমদা দ্রুতবেগে কাছে আসিয়া বাবার হাত ধরিল। পিতা কন্যাকে যথোচিত তিরস্কার করিল। তিরস্কার করিতে করিতে কন্যার হাত ধরিয়া, সেই রজনীতেই বাড়ীতে লইয়া গেল। রজনী অবসানপ্রায়, এমন সময়ে বাহিরের দ্বারে প্রাণকৃষ্ণ আঘাত করিল। বাটীর ভিতরে প্রাণকৃষ্ণের স্ত্রী ও একটী মেয়ে-লোক ছিল। মেয়ে লোকটী বলিল, কেও? অবশেষে সে দ্বার খুলিয়া দিল। প্রেমদার মা, প্রেমদাকে দেখিয়া অবাক হইল। প্রেমদার বাপ, যতদূর জানিয়াছিল সব বলিল। কিন্তু প্রাণকৃষ্ণ বাবু আসল কথা কিছু জানিতে পারে নাই। পরদিন প্রাণ-কৃষ্ণ বাবু মনের দুঃখে কলিকাতায় গমন করিল।

২।৩ দিনের মধ্যে প্রেমদার সেই সব নৈতিক সাহসের কথা অন্যরূপে—বিভৎস ভাবে প্রচারিত হইতে লাগিল। প্রেমদা অল্প বয়সেই ভ্রষ্টা—যে সে এই কথা বলিতে থাকিল। প্রেমদার মার, প্রতিবাসিনীদিগের কাছে, মুখ দেখান ভার হইল। প্রেমদা কিন্তু সমুদয় নিন্দা কুৎসাকে কাকের কোলা-হলের ন্যায় ভাবিতে লাগিল। কিছু দিন পরে প্রেমদার বাপ, সমাজে এক ঘরে হইল। প্রেমদার বাপের ধোপা নাপিত বন্দ হইল।

বিবাহের পর প্রায় ২ বৎসর কাটিয়া গেল। প্রেমদা প্রত্যহ সেই জানালার কাছে বসিয়া সেই আমগাছটীর দিকে চাহিয়া কতই ভাবে। সেই দিকে চাহিয়া কখন কাঁদে—কখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগে, আপনার সোণার দেহকে—নাকের নোলকটীকে—বিকম্পিত করে।

দুই বৎসর পরে, জ্যৈষ্ঠ মাসের অপরাহ্নে, এক দিন আকাশে ভয়ানক মেঘ উঠিয়াছে। দেখিতে দেখিতে হুহু শব্দে ঝড় বহিতে লাগিল। ঝড়ের সহিত

তড় তড় করিয়া বৃষ্টি আসিল। এমন সময়ে এক জন যুবা প্রেমদাদের বাহির বাটীর দ্বারদেশে দাঁড়াইল। প্রেমদা বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপেই ছিল। বাড়ির ভিতর হইতে প্রেমদার মা ডাকিল, 'ও পিসী! ভিতরে আয়।' হঠাৎ এমন তেজে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল যে কার সাধ্য বাহিরে নামে। প্রেমদা বলিল, এ জলে আমি কি করে যাব।

যুবা দ্বারদেশে সেই যুবতীর মধুর স্বর শুনিয়াই চিনিল। ছাতা মাথায় দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া সেই চণ্ডীমণ্ডপে উঠিল।

প্রেমদা দেখিল। দেখিয়াই চিনিল। যুবা ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। যুবা যেন স্বর্গের পরীর নিকটে দাঁড়াইয়া আছে। প্রেমদার দুটী চক্ষু অশ্রুজলে ভাসিয়া গেল—সে সুখের অশ্রুজল। প্রেমদা আনন্দের ভরে একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আপনার সমুদায় পূর্ব্বজ্বালা ঝাড়িয়া ফেলিল। যুবা আর থাকিতে পারিল না। প্রণয়িনীকে—স্নেহের আলিঙ্গনে বাঁধিবার জন্য উন্মত্ত হইল—লজ্জা ভয় সঙ্কোচ সব প্রেমের তেজে পলায়ন করিল। যুবা ধীরে ধীরে প্রেমদার দিকে এবং প্রেমদা অবনত মুখে, আস্তে আস্তে, যুবার দিকে অগ্রসর হইতেছে, এত আনন্দ—এত প্রেমের উচ্ছাস যে দুজনে অগ্রসর হইতেছে, কি এক স্থানে স্থির হইয়া আছে—তাহা অনুভব করিতে পারিতেছে না। অবশেষে দুই জন যখন খুব নিকটস্থ হইল—তখন প্রেমদার মস্তক প্রাতঃসমীর সঞ্চালিত কমলের মত কাঁপিতে কাঁপিতে যুবার বক্ষে আসিয়া পতিত হইল। যুবার শরীরের রক্ত স্রোতে যেন অমৃতের ধারা সঞ্চারিত হইল। যেন সেই মস্তক স্বর্গের সমুদয় স্নেহ লইয়া, নন্দন কাননের সমুদয় সুগন্ধ লইয়া, সহস্র পূর্ণ চন্দ্রের মাধুরি লইয়া যুবার সংসারপীড়িত কর্কশ বক্ষে পতিত হইল। বৃষ্টির তেজ ভয়ানক বাড়িতেছে। কিন্তু প্রণয় বিগলিত দম্পতীর আর সে, জ্ঞান নাই। তাহারা পৃথিবীতে কি স্বর্গে তাহাই স্থির নাই।

যুবতী সমস্ত জীবনে, এমন মধুর সুখাস্বাদন করে নাই। আজ স্বামীর বক্ষে মাথা রাখিয়া প্রেমদা চরিতার্থ হইল। সে মাথা যেন বলিতেছে, তুমি গাছতলায় থাক—আর রাজসিংহাসনেই থাক, তুমি নরকেই থাক আর স্বর্গেই থাক—আমি তোমার এই সুধাময় বক্ষ কখনই ছাড়িতে পারিব না। প্রেমদা

এই ভাবে পতির কোমল সুস্নিগ্ধ বক্ষে, মাথা রাখিয়া কয় বিন্দু অশ্রুজল মোচন করিল। উত্তপ্ত তড়িতের ন্যায় সেই উষ্ণ অশ্রুবিন্দু যুবাকে যেন পুড়াইয়া ফেলিল। সে বক্ষ, বজ্রের তেজ ধরিতে পারে, কিন্তু প্রেমদার দুঃখাশ্রু বিন্দুকে কখনই সহ্য করিতে পারে না। যুবা কাঁদিতে কাঁদিতে পাগলের মত প্রেমদাকে আলিঙ্গনে বাঁধিয়া প্রেমদার মুখে একটী মধুর চুম্বন প্রদান করিল। সে চুম্বনে প্রেমদার শরীর অবশ হইয়া পড়িল—প্রেমদার শোণিতের কণায় কণায় সেই চুম্বন যেন জড়িত হইল—লোমে লোমে সেই চুম্বন যেন কি অমৃত ছড়াইয়া দিল। প্রেমদা সেই একটী চুম্বনের জন্য পথের ভিখারিণী হইতে পারে— সমুদায় লোকের গরলময়ী ঘৃণা, হাসিতে হাসিতে সহ্য করিতে পারে। যেন স্বর্গ সেই চুম্বনের ভিতর লুক্কায়িত—যেন বসন্ত সমুদয় সৌন্দর্য্যকে লইয়া তাহার ভিতরে গুপ্ত।

যুবা কথা কহিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু পারিল না—স্নেহের বেগে ভাষা মুখের ভিতরেই লুকাইয়া থাকিল। কি আর বলিবে—চুম্বনেই নীরবে থাকিয়া হৃদয়ে হৃদয়ে কত কথা কহিল।

বৃষ্টি একটু থামিয়া আসিল। প্রেমদার মা ডাকিতে লাগিল। প্রেমদা আর থাকিতে পারিল না। প্রণয়ীকে সেইখানে বসিতে বলিয়া, আস্তে আস্তে বাটীর ভিতরে গেল। বাটীর ভিতরে গিয়া আবার বাহিরের দিকে ফিরিয়া আসিল। যুবা চণ্ডীমণ্ডপ আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রেমদার ইচ্ছা আবার সেইরূপে যুবার বক্ষে মাথা রাখে। প্রেমদা চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া যুবাকে বলিল, 'কোথায় যাইবেন না—রাত্রে এইখানেই থাকিবেন'। এই কথা বলিয়া, তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতরে গিয়া মাকে বলিল, মা আমাদের বাহিরে কে এক জন এসেছে।

মা আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল। বৃষ্টি আবার মুষল ধারে পড়িতে লাগিল। ঘোরান্ধকারে পৃথিবী আচ্ছন্ন হইল।

প্রেমদাদের বাড়ির মেয়ে লোকটীকে, প্রেমদার মা বলিল, ভদ্র লোক এই দুর্য্যোগে যখন আমাদের আশ্রয়ে এসেছে, তখন তুই একবার বাহিরে গিয়ে আড়কাটা হ'তে সপ পেড়ে দিয়ে আয়; তামাকটামাক দিয়ে আয়। আর খাওয়া দাওয়ার বন্দবস্ত কি প্রকার হবে জিজ্ঞাসা করে আয়।

দাসী বাহিরে গিয়া মাছুর পাতিয়া দিল। তামাক সাজিয়া দিল।

এদিকে প্রেমদা মার ভাল ভাবগতিক দেখিয়া বড়ই আনন্দিতা হইল। একখানা রেকাব লইয়া মাকে বলিল 'মা রেকাবে ক'রে জলখাবার পাঠায়ে দিলে হয়'। মা বলিল 'হাঁড়িতে সন্দেস আছে দাও'।

হাঁড়িতে সন্দেস ছাড়া আরও খাদ্য সামগ্রীছিল। প্রেমদা সর্ব্বপ্রকারের জিনীস দিয়া রেকাব সাজাইল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা সন্দেশ গুলি রাখিয়া গোটা গোটা সন্দেশ বাহির করিল। প্রেমদার মা হইলে ৩।৪টী সন্দেশ দিয়াই সারিত। প্রেমদা ৬।৭ খানা সন্দেশ ৫।৬টী মতিচুর দিয়া রেকাব পুর্ণ করিয়াছে। প্রেমদার মা আসিয়া দেখিল ৫।৬ জনের জলখাবার রেকাবে। দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বলিল 'এমন তো হাবাতে মেয়ে দেখিনে—তুটা সন্দেশ দে, আর না হয় তুটা মতিচুর দে—ও কি? এক রেকাব জিনীস কাকে দিতে যাচ্ছিস! পাড়ার লোক কি কুটুম্ব তো আর নয়!

প্রেমদার মনে বড় কষ্ট হইল। রাগ করিয়া বলিল, তা যা হয় তুমি দাও।

প্রেমদার মা, একটী সন্দেশ ও একটী মতিচুর দিয়া, দাসী দ্বারা একটী বড় ঘটী করিয়া জল দিয়া পাঠাইল। প্রেমদা বড়ই মনে মনে লজ্জিতা ও ক্রোধিতা হইল।

প্রেমদা। তোমার মার উপর তোমার রাগ করা উচিত নহে। যুবা যে তোমার মার জামাই তা তোমার মা জানেন না। সে তোমার প্রাণেশ্বর হইতে পারে, কিন্তু তোমার মার কাছে সে এক জন সামন্য পথিক।

তাহার পর যুবার খাওয়া দাওয়া হইল। বাহিরে যুবার জন্য বিছানা প্রেরিত হইল।

প্রেমদা মার কাছেই শয়ন করিল। মেটে ঘরের দ্বারে সেই দাসী শুইয়া থাকিল। যখন সকলে নিদ্রায় নিমগ্না। প্রেমদা আস্তে আস্তে ঘরের দ্বার খুলিল। প্রেমদার একটা এই সুবিধা ছিল, যে তার মার বড় গভীর নিদ্রা—ঘুমাইলে অনেক হাঙ্গাম হুজ্জুত করিলে তবে ঘুম ভাঙ্গিত। বাহিরে যে দাসী ছিল তারও প্রত্যহ রাত্রে হাড় ভাঙ্গা জ্বর আসিত।

প্রেমদা আস্তে আস্তে বাহিরে আসিল। ধীরে ধীরে সেই যুবার বিছানার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। যুবা নিদ্রিত। যুবার হৃদয়ে প্রেমের খুব

গম্ভীরতা ছিল—অস্থিরতা ছিল না। প্রেমদা বিছানার কাছে গিয়া দেখিল, স্বামীর গা ঘামে ভাসিতেছে, গায়ে মশা ছাঁকিয়া ধরিয়াছে। ইচ্ছা যুবকে বুকে ধরিয়া আপনার ঘরের ভিতরে লইয়া যায়; কিন্তু ততটা সাহস কই? কাছে বসিয়া আপনার আঁচল দিয়া গায়ের ঘাম মুছিয়া দিল—বাতাস করিতে লাগিল।

যুবার হঠাৎ নিদ্রা ভাঙ্গিল। জাগ্রত হইয়া দেখিল কাছেই তার জীবনেশ্বরী।

প্রেমদা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল 'তোমার খাওয়া দাওয়া ভাল হয় নাই—বিছানাও ভাল হয় নাই।'

ক্ষীরোদ বলিল 'তাহাতে কি? তোমায় যে পাইয়াছি ইহাই আমার সৌভাগ্য।

বলিতে বলিতে ক্ষীরোদের কথা স্নেহে আর্দ্র হইল। কাঁদ কাঁদ হইয়া প্রেমদার গলা জড়াইয়া বলিল, কিন্তু প্রেমদা! রাত্রি প্রভাত হইলেই সব ফু াইল।

প্রেমদা কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, 'আমি তোমার সঙ্গে যাইব।

ক্ষী। পারিবে?

প্রে। তোমার জন্য সবই পারি।

ক্ষী। তুমি এতদিন আমার জন্য কি অবিবাহিতা আছ?

কথাটায় প্রেমদার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল—কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, 'না—বাবা আমার বিবাহ দিয়েছিলেন।'

ক্ষী। তুমি তা হ'লে পর স্ত্রী?

এই কথা বলিয়াই ক্ষীরোদ দূরে সরিয়া বসিল।

প্রে। আমি বরাবরই তোমার। বিবাহ হইয়াছে নাম মাত্র।

ক্ষীরোদ চক্ষু আরক্ত করিয়া বলিল 'তুমি তবে কলঙ্কিতা?

ক্ষীরোদ যদি বিষাক্ত তরবারে পেঁচাইয়া পেঁচাইয়া প্রেমদার মাথা কাটিত যদি নরকের করাল গ্রাসে ফেলিয়া দিত, তো—প্রেমদার এত যাতনা হইত না। প্রেমদা সেই কথা শুনিবামাত্র কাঁপিতে কাঁপিতে যুবার পদতলে পতিতা হইল।

প্রেমদা ধীরে ধীরে বলিল 'আমি যদি কলঙ্কিতা হইয়া থাকি সে তোমারি জন্য,

ক্ষী। বিবাহের পর শ্বশুর বাড়িতে স্বামীর কাছে কয়দিন ছিলে ?

প্রে। আমার কথায় কি বিশ্বাস করিবেন ?

ক্ষী। আপাততঃ করিব।

প্রেমদা ক্রমে ক্রমে সব কথা বলিল। ক্ষীরোদ বলিল 'তা তুমি কি এই রাত্রে আমার সহিত যাইবে ?

প্রে। এখনি যাইব।

ক্ষী। তোমার তো নিন্দা হইবে।

প্রে। সে নিন্দা আমার প্রশংসা।

ক্ষী। আকাশের জল ঝড় থামিয়াছে। এখনি তবে চল।

সেই রজনীতে প্রেমদা জন্মভূমি, জননী, পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীরোদের সহিত প্রেমের অকুল সাগরে ঝাঁপ দিল।

কলিকাতায় ক্ষীরোদের প্রকাণ্ড অট্টালিকা। ক্ষীরোদের অতুল সম্পত্তি। মধ্যে বিষয় যায় যায় হইয়াছিল—এমন কি যখন প্রথম প্রেমদার সহিত দেখা হয়—তখন এক প্রকার পথের ভিখারী। পরে ক্রমাগত দুই বৎসর আত্মীয় স্বজনের সহিত মোকদ্দমা করিয়া, বিষয় উদ্ধার করিয়াছে। বিষয় উদ্ধারের পর এই প্রেমদাকে পাইয়াছে।

ক্ষীরোদের সংসারে কেহ নাই। বাপ, মা, ভাই, ভগিনী—সব মারা গিয়াছে। বিবাহ এ পর্য্যন্ত করে নাই।

প্রেমদাকে কলিকাতার বাটীতে লইয়া গেল। বাটীতে ২।৩ জন দাসী নিযুক্ত করিয়া দিল। কিন্তু ক্ষীরোদ প্রেমদাকে স্ত্রীভাবে তখনও দেখিতে পারিতেছে না।

একদিন প্রেমদাকে চুপে চুপে বলিল 'আমি অনেক অনুসন্ধান দ্বারা যদি বুঝিতে পারি, তোমার সেই সব কথা সত্য—তুমি তোমার বিবাহিত স্বামীকে স্পর্শ কর নাই, তাহা হইলে তোমায় গ্রহণ করিব। নতুবা তোমায় বিসর্জ্জন করিব।'

ক্ষীরোদ একদিন কলিকাতার হেদোর পুকুরের ধারে বেড়াইতেছে, এমন সময়ে এক বন্ধু আসিয়া বলিল, ওহে ক্ষীরোদ বাবু একটা মজা শুনেছ ?

কি ?

আমার এক বন্ধুর বড় মজার বে হয়েছে।

কি প্রকার ?

সেই বন্ধু আগা গোড়া মুর্চ্ছা হইতে প্রেমদার সেই সব কথা, খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া ক্ষীরোদের প্রাণ সুশীতল হইল। কি একটা যেন পাথরের মত প্রাণ হইতে সরিয়া গেল। প্রেমদা স্বর্গের দেবী—ক্ষীরোদ তাহার অবমাননা করিয়াছে—ভাবিতে ভাবিতে ক্ষীরোদের প্রাণে বড়ই কষ্ট হইল।

ক্ষীরোদ বাড়িতে গিয়া প্রেমদার ঘরে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রেমদার হাত ধরিয়া বলিল 'প্রেমদা ! আমি বড় পাপিষ্ঠ— তোমায় দুর্ব্বচন বলিয়া মহা অপরাধ করিয়াছি—আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।

প্রেমদা ঈষৎ হাসিয়া বলিল 'অমন কথা কি বলিতে আছে। তুমি যে আমার চরিত্রে সন্দিগ্ধ হইয়া সন্ধান লইয়াছ, ইহা আমারই সৌভাগ্য। যদি আমাকে কলঙ্কিতা স্থির করিয়া আমায় পরিত্যাগ করিতে, তাহাতেও আমি দুঃখিতা হইতাম না। তুমি যদি আমায় কাটিয়া ফেল, তাহাতেও আমার সুখ।'

ক্ষীরোদ প্রেমদার মুখ হইতে মধুময়ী কথা শুনিতে শুনিতে বিমুগ্ধ হইয়া প্রেমদাকে বক্ষে ধরিয়া মুখ চুম্বন করিল।

তাহার পর দুই জনে সুখ সচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল।

প্রেমদা মা বাপকে আনাইয়া আপনকাছে রাখিল।

ইতিঃ।

ছাত্র ও ছাত্রীর প্রণয়।

কোননগরে, গঙ্গাতীরে একটী বালিকাবিদ্যালয় ছিল। পাঁচ বৎসর হইতে চৌদ্দবৎসর পর্য্যন্ত বয়সের বালিকারা সেখানে পড়িত।

ঘোষেদের একটী মেয়ে। তার নাম সুখ-তারা। বয়স তেরবৎসর। দেখিতে যে খুব সুন্দরী—তাহা নহে। তবে রংটা শ্যামবর্ণ হইলেও গড়নটী বড় সুন্দর। চক্ষু দুটী পটল চেরা। কাণ দুটী ছোট ছোট—সুন্দররূপে গুটান। নাকটী টিকোল, অথচ দুটী উজ্জ্বল চক্ষুর মধ্যে থাকিবার উপযুক্ত। মাংসল শরীর। রূপ চল চল করিতেছে। প্রভাত হইবার পূর্ব্বে পূর্ব্বাকাশ যেমন একটু ফরসা ফরসা বোধ হয়, যৌবনাগমনের পূর্ব্বাবস্থা বলিয়া সুখতারার সর্ব্বাবয়বের শ্যামবর্ণ একটু ধপধপে—ফরস ফরসা হইতেছে।

সুখতারা সেই বালিকাবিদ্যালয়ে প্রত্যহ, (কোন দিন ঝির সঙ্গে, কোন দিন বা একেলা) পড়িতে যায়। ৯টার সময় ভাত খাইয়া, পাণে ঠোঁট দুটী পাকা তেলাকুচা ফলের মত লাল করিয়া, জ্যাকেট গায়ে আঁটিয়া, একখানি পাছাপেড়ে শাটী পরিয়া, শ্লেটের সহিত বইগুলি বগলে ধরিয়া, ধীরে ধীরে পা ফেলিতে ফেলিতে, পথ সুশোভিত করিয়া স্কুলে যাইয়া, থাকে। সুখতারা আপনাদিগের বাটী হইতে বাহির হইবার পরে, কিয়দ্দূর গিয়া, পথ পার্শ্বস্থ এক ব্রাহ্মণদিগের বাটীতে যায়; গিয়া কুমুদিনী নাম্নী একটী ১০ বৎসরের বালিকাকে সঙ্গে লয়; তার পরে দুজনে গুটি গুটি স্কুলে যায়।

এক দিন ৯টার পর, সুখতারা বাটী হইতে কিয়দ্দূর গিয়াছে—হঠাৎ মাথার ফুল কাঁটাটী টুপ্ করিয়া পশ্চাতের দিকে পড়িয়া গেল। সুখতারা জানিতে পারিল না। কিন্তু পিছন হইতে একটী সতর বৎসরের ছাত্র ডান হাতে সেই ফুল কাঁটাটী ধরিয়া, 'সুখতারা তোমার ফুল কাঁটা লও' বলিয়া যেমনি সুখতারার কবরিতে পরাইয়া দিতে যাইবে, অমনি সুখতারা পিছন দিকে ঘাড় ফিরাইল। ঘাড় ফিরানর জন্য কাঁটাটী আবার পড়িয়া গেল, ছাত্রটী আবার কুড়াইয়া, যেমনি আবার পরাইয়া দিতে যাইবে, সুখতারা লজ্জাপূর্ণ একটু হাসির রেখায় অধরদ্বয় প্রফুল্ল করিয়া—হাত পাতিয়া বলিল "গোপাল! ফুলকাঁটা দাও"। গোপাল সুখতারার হাতে ফুলকাঁটা দিল। সুখতারার কোমল হাত

খানি ছুঁইবামাত্র, কেন তা জানিনা, সুখতারা অবনত মুখে এক ফোঁটা চখের জল ফেলিল, সেই জলের ফোঁটাটী গোপালের হাতের উপর পড়িয়া গেল। গোপাল সে সময়ে কিছু বলিল না— ভাবিল না; তবে সে সময়ে গোপাল আপনার প্রাণে যেন একটু খাঁটি আরাম বোধ করিয়াছিল। ফুলকাঁটাটী হাতে দিয়া, গোপাল চলিয়া গেল। গোপাল যখন পিছনে সুখতারাকে ফেলিয়া যাইতেছিল, সুখতারা একদৃষ্টে অনেকদূর পর্য্যন্ত গোপালকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। পরে, যখন গোপাল দৃষ্টি-বহির্ভূত হইল, সুখতারার দুটী চক্ষু স্বর অশ্রুস্পর্শে ছল্ ছল্ করিতে থাকিল—সে দিন স্কুল যাইতে ভাল লাগিল না।

সুখতারার ওটা একটী প্রণয় চিহ্ন। কিন্তু প্রণয়ের সূত্র পাত নহে। দুই বৎসর আগে, যখন সুখতারাদিগের বাটীতে, শ্যামা পূজার রাত্রে, বৌমাষ্টারের যাত্রা হয়, তখন গোপাল যাত্রা শুনিবার সময়, সুখতারার কাছে বসিয়া ছিল। সেই সময়ে সুখতারা গোপালের মুখখানি, হাসিটুকু, চখের জল পড়াটী, হাতনাড়াটী, কতবার তারিপ করিতে করিতে দেখিতে থাকে। জনতার ভিড় হওয়ায়, একবার গোপালের আঁটুটী, বালিকার আঁটুর সহিত মিশ্র হইয়া যায়, এবং মাঝে মাঝে গোপালের ডান হাতের আঙ্গুলগুলির সহিত বালিকার বাম হাতের আঙ্গুলগুলির কি প্রকার গুপ্ত আলিঙ্গন হয়। সেই সময়েই সুখতারার হৃদয়টা গোপালের পক্ষপাতী হইয়া পড়ে। সেই রাত্রে গোপাল যাত্রার সভার অন্যস্থানে গিয়া বসিলে, বালিকার প্রাণটী বিমর্ষতায় ভারি হয়—যাত্রার মাধুর্য্যে একটু তিক্তরস পড়িয়া যায়। যাত্রার সভায়, গোপালের প্রতি সুখতারার প্রণয়-সঞ্চার হয়। এই দুই বৎসরের মধ্যে গোপালের বালিকার সঙ্গে দেখা শুনা বড় একটী হয় না। বালিকা যে মাঝে মাঝে গোপালকে ভাবিত তার প্রমাণ পাওয়া যায়; সুখতারা শ্লেটে আঁক কসিতে কসিতে গোপালের নাম লিখিত; আপনার পুস্তকের পাতার সাদা যায়গায় হঠাৎ গোপালের নাম লিখিয়া, আবার কালি দিয়া, ঢাকা দিয়া রাখিত। কখন কখন গোপালদের বাটীর ধারে, রাস্তায় দাঁড়াইয়া গোপালকে দেখিবার জন্ত তাহার পড়িবার ঘরের জানালার দিকে তাকাইয়া কি যেন ভাবিত। দুই বৎসর পরে সেদিন স্কুলে যাইতে যাইতে, সৌভাগ্য বলে, ফুলকাঁটাটী পড়িয়া যাইব

গোপাল কোথা হইতে স্বয়ং হাতে করিয়া, মাথায় ফুলকাঁটা পরাইয়া দিতে যাইবার সময় ঐরূপ ব্যাপার ঘটে।

সে দিন স্কুলে যাওয়া ভাল না লাগিলেও, অনিচ্ছায় সুখতারা স্কুল গেল। সেদিন বরাবর অন্যমনস্কা ছিল। পড়া বলিবার সময় মাঝে মাঝে ভুল বলিতে লাগিল—আগে একটীও পড়া বালিকা ভুলিত না। অঙ্ক কসিবার সময় ২এর যায়গায় ৩, ৪এর যায়গায় ৮ পড়িয়া যাইতে থাকিল। সেদিন সুখতারার নামতা পড়াইবার পালা ছিল। পড়াইবার সময় বড় গোলমাল হইল, গুরু মা বকিতে বকিতে বলিলেন "হ্যা সুখতারা। আজ তুমি স্কুলে এসে অবধি, ক্রমাগত ভুল করছ কেন? বালিকা একটু লজ্জায় মুখ হেঁট করিল—কোন্ উত্তর দিল না। নামতা পড়াইবার সময়, তিন দশে চল্লিশ, বলিবামাত্র অনেক বালিকা হাসিয়া উঠিল—গুরু মা অবাক হইলেন। তার পর, আবার যখন—আট দশে আটাত্তর বলিল, তখন গুরু মা রাগিয়া সুখ-তারাকে পদচ্যুতা করিয়া, তিরস্কার করিতে করিতে আর একটী বালিকাকে সেই পদ দিলেন। সে ঠিক পড়াইতে লাগিল।

গোপাল স্কুলে রোজ যেমন যায়, পড়া বলে, অঙ্ক কসে তেমনি সবই করিল। স্কুল হইতে বাটী আসিল। তার পর সন্ধ্যার আগে গঙ্গার ঘাটে গিয়া বসিল। বসিয়া নৌকা দেখিতেছে, হিল্লোলের খেলা দেখিতেছে—আর মাঝে মাঝে কত কি ভাবিতেছে। মানুষের মন স্থির থাকিতে পারে না—ভাবের স্রোত মনে সর্ব্বদাই বহিয়া থাকে। গোপাল গঙ্গার ওপারের গাছ পালা, তেজোহীন সূর্য্য, জলের রঙ্গভঙ্গ, মাঝিদের দাঁড় টানা প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে, মাঝে মাঝে একটু একটু অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে লাগিল :—কি ভাবিল?—ভাবিল—আকাশ, তারা, সরোবর, জল, মাছ, মাছরাঙা পাখী, চিল; আবার সরোবর জল, কমল, ফুল, তার পরই ফুল কাঁটা—এই খানে চিন্তাস্রোতে ভাসিয়া আসিয়া গোপাল আটকাইয়া পড়িল। সেই ফুলকাঁটা ভাবিবার পরই, ভাবিল,—সেই কবরী—সেই মুখ—সেই চোখ—তার পরেই সেই হাতের উপর সুখতারার অশ্রুজলের ফোঁটা। গোপালের প্রাণটা এইখানে থমকিয়া দাঁড়াইল—সেই কথাগুলা বারবার ভাবিতে লাগিল—আলোচনা করিতে থাকিল—হাড়ে মাসে রক্তে জড়াইয়া অমৃতস্পর্শে সিহরিতে থাকিল। ভাবিতে

ভাবিতে হৃদয়টা সেই দিকেই ঝুঁকিতে লাগিল। গোপাল যত ভাবে ততই মিষ্টতা পায়। গোপাল বিশেষরূপে এই ভাবিল, ফুলকাঁটা দেবার সময় আমার হাতে তার অশ্রুজলের ফোঁটাটী কেন উত্তপ্তভাবে পড়িয়া গেল? অমি তো জোরে হাতের উপরে ফুলকাঁটাটী পরাইয়া দি নাই যে, লাগিবার দরুণ যাতনায় কাঁদিয়াছে? তবে কাঁদিল কেন? গোপাল খানিক ভাবিয়া ঘরে গেল—রাত্রে প্রদীপ লইয়া রীতিমত পড়িতে থাকিল। ওসব আর ভাবিল না।

পর দিন স্কুলে যাইবার সময়, কালিকা পথে বড় আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল—কি ভাবিতে থাকিল—বোধ হয় ভাবিতেছিল আবার ফুলকাঁটা পড়িয়া যাউক, গোপাল আবার সেইরূপ করুক। বালিকা যাইতে যাইতে পিছনের দিকে তাকাইতে লাগিল। খানিকদূর গিয়াই একটা পয়সা হারাইবার ভাণ করিয়া রাস্তার দুইপাশের ঘাসবনে খুঁজিতে লাগিল। এমন সময়ে গোপাল মধুর বেশে সেইখানে পুস্তক হাতে লইয়া স্কুলের সাজে উপস্থিত হইল। যেন ঘোরান্ধকার ভেদ করিয়া সূর্য্যোদয় হইল। বালিকার বুকটী একটু গুর গুর করিল; রক্তস্রোত একটু জোরে চলিতে লাগিল। বালিকা যুবার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিল। যুবা বালিকাকে দেখিবামাত্র একটী ভাবের তোড়ে আক্রান্ত হইল—হৃদয়টা কেমন একটা যেন গোলমেলে ধরণে চঞ্চল হইল—যুবা সতৃষ্ণ নয়নে বালিকাকে আপাদমস্তক দেখিতে দেখিতে চলিতে লাগিল। একটী মেঘের ভিতর হইতে আর একটী মেঘে যেমন বিদ্যুৎ প্রবেশ করে, সেইরূপ একটী কি যেন এক জনের বুক ভাঙ্গিয়া অপরের বুকের ভিতর প্রবেশ করিল। যুবা বালিকাকে পথে রাখিয়া চলিয়া গেল। বালিকা একদৃষ্টে যুবাকে নিরীক্ষণ করিতে থাকিল। যুবা বালিকাকে অগ্রসর হইবার পরে, একবার ব্যাকুল ভাবে পিছনের দিকে তাকাইবামাত্র দেখিল, বালিকার দুচক্ষু অশ্রুজলে ঢলঢল করিতেছে—ম্লানভাব মুখের দীপ্তিতে মিশ্রিত রহিয়াছে। বালিকার ম্লান মুখে অশ্রুভার দেখিবামাত্র যুবকের হৃদয়ের তল দেশ হইতে একটী উদ্বেগ উঠিল—প্রাণটা বড় খারাপ হইল—চলনের বেগকে কমাইয়া আবার পিছনে ফিরিয়া দেখিল, বালিকা আঁচলে চক্ষু মুচিতে মুচিতে অতি ধীরে ধীরে আসিতেছে। সেদিন যুবার স্কুল যাইতে ভাল লাগে নাই।

২।

সুখতারা গোপালদের বাটীতে বেড়াইতে যাইত। এবার ঘন ঘন যাইতে লাগিল। একদিন গোপাল পড়িবার ঘরের চৌকাটে বসিয়া কি ভাবিতেছে এমন সময়ে (তখন সেখানে কেহ ছিল না) সুখতারা সেইখানে গোপালকে একটী ছোট ছেলের দ্বারা একখানি পত্র পাঠাইয়া দিল। গোপাল পত্রখানি লইয়া ঘরের ভিতরে গিয়া পড়িল।

গোপাল!

আমি তোমার কাছে যাইয়া সব বলিব ভাবিয়াছিলাম—লজ্জায় পারিলাম না। তুমি আমায় একটী কথা বলিবে কি না? তুমি কাকে বিবাহ করিবে?

পত্রে আর কিছু লেখা নাই। নিম্নে কাহারও স্বাক্ষর নাই। পত্র পড়িয়াই গোপাল বুঝিল, ইহা সুখতারার পত্র। গোপাল ভাবিতে লাগিল। ভাবিয়া উত্তর লিখিল:—

"তুমি কে জানিতে পারিলাম না। বোধ হয় বিবাহ করিব না। যদি সুখতারা বিবাহ করে, তো তাকেই বিবাহ করিব—কারণ সে আমার অনেক দিন হইল প্রাণ কাড়িয়া লইয়াছে"।

গোপাল আপনার একটী পাঁচ বৎসরের ছোট ভগিনী দ্বারা এই পত্রখানি সুখতারার কাছে পাঠাইল। সুখতারা একবার পড়িল। তার পর এক লাইনের এক একটী কথা ৩৪ বার করিয়া পড়িতে লাগিল। যেন অক্ষরগুলি খাইতে থাকিল; যেন প্রাণটা সেই পত্রশয্যায় পড়িয়া বারবার গড়াগড়ি দিতে থাকিল। পত্রখানি একবার একবার পড়িতেছে আর পিছনের দিকে দেখিতেছে কেহ আসিতেছে কিনা। কিয়ৎক্ষণ পরে, সেই পত্রখানি গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া রাখিল। অবসরে নিরিবিলি দেখিয়া মাঝে মাঝে—পড়িতে ছাড়িল না—জগতে তেমন মধুর লেখা বালিকা কখন পড়ে নাই। একটী কথা মাঝে মাঝে বালিকার স্মৃতিকে বড় উন্মত্ত করিয়া, অধরে হাসির রেখা ফুটাইয়াছিল। সেটী সেই পত্রের "যদি সুখতারা বিবাহ করে তো—বিবাহ করিব" এই কথা। সে ভাবটী প্রাণে সর্ব্বদাই বিহার করিতে লাগিল—সে কথাটী ভাবিতে ভাবিতে বালিকা কখন মুচকিয়া হাসে—আহ্লাদে আট খানা হয়—

আবার নৈরাশ্যের ভারে মলিন মুখী হইয়া—এক একটী দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করে।

৩।

দুজনের ভিতরের কথা আর কেহ জানিল না। জানিল কেবল ঈশ্বর। বালিকা প্রত্যহ বাটীর ঠাকুরের কাছে প্রণাম করিবার সময় ব্যাকুলভাবে গোপালের ভালর জন্য প্রার্থনা করিত।

বালিকার বাপ, মা, ঠাকুর দাদা, ঠাকুর মা, ভাই ভগিনী খুড়া জ্যাটা সবই ছিল। বড় মানুষের ঝি। তবে পিতা বড় ব্রহ্মজ্ঞানী ছিল, ঠাকুর দাদাও ইংরাজি ভাবের ভক্ত ছিল। সুতরাং সুখতারার বিবাহে বিলম্ব হইতে লাগিল। পিতা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল চৌদ্দ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ দিবে না। সমাজের অন্যান্য মেয়ে অপেক্ষা সুখতারা একটু স্বাধীনতা পাইয়াছিল—তার প্রমাণ তের বৎসরের মেয়ে প্রায়ই একলা স্কুলে যাইত—কোন কোন দিন "স্কুলের ঝি" সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইত।

সুখতারা তের বৎসরের যখন, তখনও স্কুলে পড়িত—চৌদ্দ বৎসরে পদার্পণ করিবামাত্র বিবাহের সম্বন্ধ চারিদিক হইতে আসিতে লাগিল। কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ সুখতারার বিবাহ দেওয়া স্থির করিল। এই সময়ে সুখতারার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইল।

৪।

যে দিন সুখতারার বিবাহ হইবেক, সেই দিন সুখতারা বড় কাঁদিতে লাগিল। সে কান্না কিছুতেই থামে না। সুখতারা একটী কথা গুরুজনদিগকে ফুটিয়া বলিবার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিল—কিন্তু সেটী বলা আর খুন করা যেন তুল্য বলিয়া বোধ হইল। সুখতারা ভাবিতে লাগিল, এখন উপায় কি? কাকে একথা বলিব? কি প্রকারে বলিব? না—বলিব না—যা হয় হউক। আবার ভাবিল, কি? গোপালকে ছাড়িয়া আমি আবার কাকে স্বামী বলিব? তাকি হয়? আমি বিষ খাইয়া মরিব ভাল—তবু গোপাল ছাড়া আর কাকেও স্বামী বলিয়া ডাকিতে পারিব না। এখনি ঠাকুর মাকে খুলিয়া বলিগে। লোকে নিন্দা করিবে? জ্যাটা মেয়ে বলিবে? তা বলে বলুক; আমার গোপাল বড়

না নিন্দাভয় বড় ? আমি গোপালের জন্ত যখন মরিতে পারি, চিরকাল আইবুড় থাকিতে পারি তখন আবার নিন্দার ভয় করিব কেন ? আমি যাই—ঠাকুর মাকে খুলিয়া বলিগে।" আবার ভাবিল, মুখ ফুটিয়া বলিতে না পারি, কারও দ্বারা বলাই।" আবার ভাবিল—কার দ্বারা বলাইব ? সে যদি না বলিয়া—বলে, "বলিয়াছি" তাহ'লেই তো সর্ব্বনাশ! তবে কি করিব ? ঠাকুর মাকে পত্র লিখিয়া জানাই। এই ভাবিয়া আপনার ঘরে খিল আঁটিয়া পত্র লিখিতে লাগিল। কলম হাতে করিয়া কাগজ পাতিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতে লাগিল। পথের সেই ফুল কাঁটা পড়ার কথা, গোপালের সেই সজল নয়নে ফিরিয়া দেখার কথা, গোপালের সেই পত্রের কথা ভাবিতে ভাবিতে বালিকা আকুল প্রাণে কাঁদিয়া পত্র লিখিবার কাগজ ভাসাইতে লাগিল। বড় বড় অশ্রুজলের ফোটা টপ্ টপ্ করিয়া সেই কাগজে পড়িয়া কাগজ খানাকে আর্দ্র করিয়া ফেলিল। সুখতারা কাঁদিতে কাঁদিতে লিখিল :—

ঠাকুর মা!

লিখিয়াই আসল কথা লিখিবার সময় হাত কাঁপিতে লাগিল হৃদয়োচ্ছ্বাসে বুক কাঁপিতে থাকিল। লেখাটী কম্পিতা লেখনীতে আরম্ভ করায় এঁাকা বঁ্যাকা হইতে থাকিল; লেখার উপরে মাঝে মাঝে চখের জলের ফোটা পড়িতে লাগিল—দুই একটী অক্ষর সে জলের ফোটায় অদ্ধ বিগলিত হইয়া গেল। মনকে স্থির করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াও স্থির করিতে পারিল না। যত রাত্রি নিকটে আসিতে লাগিল বেলা বাড়িতে থাকিল ততই যেন, বালিকার অন্তিমকাল—যম সদন সন্নিকট প্রায় বোধ হইতে লাগিল। ঘরের ভিতরে বসিয়া ২ ঘণ্টা পত্র লিখিতে চেষ্টা করায় ৪ ৫ খানা কাগজ অশ্রু জলে, কম্পিত লেখনীর উৎপাতে, নষ্ট করিয়া, অনেক কষ্টে লেখাটী সম্পন্ন করিল। যেন একটী দায়ে উদ্ধার পাইল। সে পত্র খান এই:—

ঠাকুর মা।

আজ আমার বিবাহ। তোমাদের বড় আনন্দ। আমার মনে বড় দুঃখ—কষ্ট—যাতনা। আজ আমার বিবাহের আয়োজন স্থলে যদি শ্মশানে যাইবার আয়োজন করিতে তো, আমার আমোদ হইত। যদি আমার আজ বিবাহ দাও

তো বিষ খাইয়া মরিব। যদি আমার বিবাহ দিয়া সুখী কর, তো মিত্রদের গোপালের সঙ্গে আমার বিবাহ দাও। যদি না দাও তো আমাকে কাল আর দেখিতে পাইবে না।' ইতি।

সুখতারা।

সুখতারা পত্র খানি লিখিয়া পেট কাপড়ে রাখিল। ঠাকুর মার কাছে পত্র দিবার জন্য ৪। ৫ বার আনাগোনা করিল। কিন্তু দিবার সময় লজ্জা আসিয়া বাধা দিতে লাগিল। ক্রমশঃ দিন ফুরাইতেছে—সুখতারার দুঃখ বাড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল—তখনও "দি" "দি" করিয়া বালিকা পত্র দিতে পারে নাই। পত্র খানা ঠাকুর মাকে দিবার জন্য বালিকা ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকিল। কিন্তু লজ্জায় সব মাটী হইতে লাগিল। অনেক যত্নে গোপনে মনটাকে পত্র দিবার জন্য প্রস্তুত করে; কিন্তু ঠাকুর মার কাছে গিয়া, হয়তো দেখে, ঠাকুর মা কাজে ব্যস্ত, না হয়, কাহারও সহিত আলাপে নিযুক্ত; তাহা দেখিয়া মনটী মুচড়াইয়া যায়—দিতে গিয়াও দিতে পারে না।

সন্ধ্যার পরেই মহাসমারোহে বর আসিল। বাজী পুড়িল—বাজনা বাজিতে লাগিল। বাড়ীতে লোকের ভিড় হইল—বাটী আনন্দ কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল। বর সভা আলো করিয়া বসিল। বিবাহ সভা, ফুল আতর গোলাপের গন্ধে ভরিয়া গেল। নানা কথা, আলাপ, জিজ্ঞাসা পড়ার, হুড়াহুড়ি পড়িল। সুখতারা সেই সময়ে আপনার বিপদ উপস্থিত দেখিয়া ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা করিল "ঈশ্বর আমায় বিপদে রক্ষাকর।" কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবানকে ডাকিবা মাত্র, একটী নূতন তেজ তার প্রকৃতির গুপ্তস্থান হইতে উঠিয়া, হৃদয় প্রাণে মহাতেজের—মহা সাহসের আগুণ জ্বালিয়া দিল—বালিকাকে অভিভূতা করিল—তার বিকৃতলজ্জাকে পুড়াইয়া—সৎসাহসে সবলা করিল। যেন আর একটী লোক—মহাবলে সুখতারার কথাটী জানাইবার জন্য সুখতারাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া, তাহার অস্তিত্বে বসিয়া, সেই বিপদে পত্র খানা দিবার ভার গ্রহণ করিল। সেরূপ তেজ সুখতারা কখন অনুভব করে নাই। সেটী নৈতিক তেজের স্ফুরণ, কি দেব শক্তির আবির্ভাব, তা ঠিক বলিতে পারিনা; তবে এইমাত্র বলিতে পারি, সে দুর্লভ সামগ্রীটী এ বঙ্গদেশে—ভারতবর্ষে—আর বাস করে না—এক সময়ে সাবিত্রী, দময়ন্তী, পদ্মিনী

প্রভৃতি সতীদিগের "প্রাণের অন্দর মহলে বাস করিয়াছিল—এখন ইউরোপ আমেরিকায় গিয়া, সে দেশকে স্বর্গের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। নীতি দর্শনে ইহাকে নৈতিক সাহস কহে। এই জিনিসটী যখন বালিকার প্রাণে ভাবের মহা তুফান লইয়া আসিয়াছিল—তখন বালিকার মুখের রং বদলাইয়াছিল, দৃষ্টি পাপভেদী হইয়াছিল—সর্ব্বাবয়বে একটা প্রখরা দীপ্তি ফুটিয়াছিল। সুখতারা, বিবাহের দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে সেই সাহস বুকে ধরিয়া—ভাবে ফুলিতে ফুলিতে—আরক্ত নয়নে—কম্পিত দেহে—ঠাকুর মার কাছে গেল। সেখানে আরও অনেক লোক ছিল দেখিয়া, ঠাকুর মাকে আঁচল ধরিয়া আকর্ষণ করিল—ঠাকুর মার তখন প্রাণটী যেন কেমন হইয়া গেল; কিছু না বলিয়া উদ্বিগ্ন প্রাণে পিছনে পিছনে যাইল—একটী ঘরে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধা দেখিল নাতিনীর চেহারাটী পাগলিনীর মত। ঘরে গিয়া নাতিনী ঠাকুর মার মুখের দিকে চাহিয়াই কাঁদিতে লাগিল—কাঁদিতে কাঁদিতে ঠাকুর মার গলা জড়াইয়া, গলার কাছে মুখ গুঁজিল—গুজিয়া অজস্র ধারে উত্তপ্ত অশ্রু মোচন করিতে লাগিল। দেখিয়া ঠাকুর মার আত্মাপক্ষ উড়িয়া গেল। ঠাকুর মা কাঁদ কাঁদ ভাবে ভীত স্বরে জিজ্ঞাসিল? "আজ শুভদিনে কান্না কেন? হয়েছে কি?

বালিকা তখন মুখ তুলিয়া বলিল "আমাকে তোমরা মেরে ফ্যাল।" বলিয়াই পাগলিনার মত ঠাকুর মার মুখের দিকে সজল অগ্নিপূর্ণ নেত্রে তাকাইয়া থাকিল।

ঠাকুর মা অবাক হইয়া আবার জিজ্ঞাসিল, ওকি? আজকের দিনে ওকি?

বা। কেন? আজ আমার কি?

ঠাকুর মা। সে কিলো? আজ তোর বিয়ে, অমন সব করা কি ভাল!

বালিকা তখন উন্মাদিনীর মত বলিল "আমার বিয়ে না শ্রাদ্ধ! আমি ওকে বিয়ে করবো না! আমি বিষ খাব সেও ভাল, তবু আজ ওকে বিয়ে ক'রবো না—যা ঠাকুর দাদাকে ব'লগে যা! এই আমার চিটি লয়ে ঠাকুর দাদাকে শোনাগে যা! বাবাকে মাকে শোনাগে যা! আমি এই বার বিষ খেয়ে মরিগে।" বলিয়াই বালিকা সেইখানে বসিয়া পড়িল—সমুদয় পৃথিবীটী যেন ঘুরিতেছে বোধ হইল—মম যাতনা অনুভব করিতে লাগিল। বৃদ্ধা

ঠাকুর মা, সুখতারার ভাবভক্তি দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর নিকটে গেল—চিঠি দেখাইল। তার পর ছেলে বউ মেয়ে সকলকে চুপে চুপে বলিল। সকলে শুনিয়া অবাক হইল। সুখতারার পিতা ব্রহ্মজ্ঞানি মানুষ। মেয়ের এই কথা শুনিয়াই পিতাকে বলিল 'বাবা! আমার মেয়ের সুখের জন্য বিবাহ, যদি এতে তার অসুখই বাড়ে তো বিবাহ দিবার প্রয়োজন কি? পরিশেষে বাটীর সকলের, সে পাত্রের সহিত বিবাহ দেওয়ায় অমত হইল। কথাটী খপ্ করিয়া চারিদিকে ছড়াইতে থাকিল। একটী গোলমাল উঠিল। এখন কে গিয়া বলিবে যে "বর উঠিয়া যাউক, বিবাহ হবে না।" সেখানে কন্যা পক্ষীয় পুরোহিত, বর পক্ষীয় পুরোহিতকে সমুদয় ব্যাপার কহিল। বর কর্ত্তা শুনিল—বর জানল। হৈ হৈ শব্দ উঠিল—গালাগালি মারামারির উপক্রম হইল—হঠাৎ এক ডজন পুলিষের লোক আসিবা মাত্র সব গোলযোগ চুকিল। বরকর্ত্তা বরযাত্রী গালাগালি দিতে দিতে, কেহ শেয়াল ডাকিতে ডাকিতে—কুকুর ডাকিতে ডাকিতে—শালা প্রভৃতি ভাষায় গালি দিতে দিতে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ভিড় কমিলে, সুখতারার পিতা গোপালের পিতার নিকটে গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পায়ে ধরিয়া বলিল, 'আমার জাত রাখিতে হবে মান রাখিতে হবে—তোমার গোপালকে আমি কন্যা সম্প্রদান করিব।' গোপালের পিতা মাতা সকলে রাজি হইল।

গোপাল তখন আপনার মনোক্লেশে বিছানায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল। হঠাৎ আপনার বাটীর ভিতরে শাঁখ বাজিতে শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। তারপরে গোপালের পিতা গিয়া বলিল, বাবা, একটু ওঠ—আজ তোমার শুভ বিবাহ। গোপাল শুনিবাই চমকিত ও পুলকিত হইল। মনে মনে ভাবিল—এ আবার কি? আমার বিবাহ কোথা? গোপাল এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময়ে গোপালের প্রিয় বন্ধু নেপাল, গোপালকে শুভ সংবাদ দিতে আসিল। সে আসিবা মাত্র গোপালের মনে যেন একটী কিসের আশা জাগিল। গোপালের পিতা তখন গোপালকে বর সাজাইবার জন্য অন্যত্র ব্যস্ত আছে। নেপাল ডাকিল—গোপাল উঠিয়া গেল। নেপাল বলিল 'সুখতারার সঙ্গে তোর এখনি বিবাহ হবে।' শুনিবামাত্র আনন্দে গোপাল কাঁদিয়া ফেলিল—

কাঁপিতে লাগিল। তার পর, কিয়ৎক্ষণ পরে গোপাল বর সাজিয়া সুখ-তারাকে বিবাহ করিতে যাত্রা করিল। শুভ বিবাহ মহাসুখে সম্পন্ন হইল। সুখতারা তার পর, মহাসুখে—গভীর প্রণয়ে—পৃথিবীতে স্বর্গ সম্ভোগ করিতে লাগিল।

বালবিধবার প্রণয়।

(গোলাপ সুন্দরী)

বামাচরণের অল্প বয়সে মা বাপ মারা যায়। সেই অল্প বয়স্ক শিশুর প্রতি পালনের ভার, তাহার ছোট মাসীর উপরে ভগবান ফেলিয়া দেন। ছোট মাসীর নাম ক্ষীরদা। ক্ষীরদা অল্প বয়সে বিধবা হইয়া পিতৃকুলের দারিদ্য বশতঃ তাঁহার মামা শ্বশুরের বাড়ীতে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। মামা শ্বশুর, মামী—শাশুড়ি, মামাত দেবর প্রভৃতি সকলে ক্ষীরদার খাটুনি, সংসারের কাজ কর্ম্মের প্রতি যত্ন প্রভৃতি দেখিয়া ক্ষীরদাকে খুব যত্ন আদর শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে থাকে।

ক্ষীরদা মামা শ্বশুরের বাড়িতেই আছেন। রান্নাঘরের একপাশে উপু হইয়া বসিয়া, (স্নানের পর বলিয়া মাথার) চুল এলাইয়া দিয়া, শিলে বাটনা বাটিতেছেন, আর তাঁর বড় ভগিনী—বামাচরণের মার সঙ্কট পীড়ার বিষয় ভাবিতেছেন। দিদি যদি মারা যান, তো বামাচরণের কি দশা হবে? কে তাকে মানুষ করিবে? বামাচরণ কার দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইবে;—ক্ষীরদা এইরূপে ভাবিতে, ভাবিতে বাটনা বাটিতে বাটিতে হাতের কব্জির উপরি ভাগ দিয়া চক্ষের জল মুছিতেছেন; এমন সময়ে একটী পরমা সুন্দরী বালিকা আসিয়া বলিল, "জ্যাটাই! তোর বাপের বাড়ী হতে লোক এসেছে"। ক্ষীরদা তাড়াতাড়ি বাটনা বাটা রাখিয়া ঘরের বাহিরে গেল। দেখিল একটী কাল বর্ণের স্ত্রীলোক, আঁটু পর্য্যন্ত ধুলা মাথা পায়ে, বাটীর উঠানে দাঁড়াইয়া আঁচল দিয়া কপালের ঘাম মুছিতেছে। ক্ষীরদা গিয়া তাহাকে দেখিয়া

উৎসাহিতা হইল ; কিন্তু সে কথা কাহিতেছে না—কি যেন বলিবে অথচ বলিতে পারিতেছে না—দেখিয়া, শশব্যস্তে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল "ও হাড়ি বউ! দিদির খবর কি ?

হাড়ি বউ দাঁড়াইয়াছিল, অমনি উঠানে মুখ হেঁট্ করিয়া বসিয়া পড়িল। ক্ষীরদার বুকটা গুরগুর করিল—অস্থির আলোড়িত করিয়া—একটী শোকের ভীবিঝড়ের আয়োজন অনুভব করিয়া—কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "বামাচরণ আমার ভাল আছে তো ?"

হাড়ি বউ দুঃখের ভারে ভাবি মুখ খানা, আস্তে আস্তে তুলিয়া একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল "আর দিদি! বামাচরণ তোমার ভাল আছে—বামাচরণ কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছে ?"

কথাটী আর কতকগুলি ভয়ানক কথার ধার লইয়া, ক্ষীরদার মর্ম্মস্থলে সংঘাতিক আঘাত করিল ; ক্ষীরদা দাঁড়াইয়া ছিল বসিয়া পড়িল। কাছে সেই পরমা সুন্দরী বালিকাটী দাঁড়াইয়া ছল্ ছল্ চক্ষে হাড়ি বউএর দিকে তাকাইয়া আছে। ক্ষীরদা বসিয়া চক্ষের জল ফেলিতে লাগিল। চক্ষু আরক্ত হইয়া টস্ টস্ করিয়া অশ্রুপাত করিতেছে—মুখ খানা দুঃখের বর্ণে ভরিয়া গিয়াছে—প্রাণটা বাকী কথাটা শুনিবার জন্য ছট্ ফট্ করিতেছে এমন সময়ে হাড়ি বউ বলিল 'দিদি! আর কেঁদে কি ক'রবে! বামাচরণের আর কেউ নাই, তুমি তাকে কাছে এনে মানুষ কর।'

তখন ক্ষীরদা যন্ত্রণার ভারে অভিভূতা হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল 'ওগো দিদি গো। কোথায় গেলি গো! তোর বামাচরণের যে আর কেউ নাই গো।"

ক্ষীরদার ক্রন্দনের সঙ্গে সঙ্গে বালিকা গোলাপ সুন্দরীও অজস্রধারে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। সেই ক্রন্দন শুনিয়া বাড়ীর অন্যান্য রমণীগণ, বালক বালিকা সকলে ক্ষীরদাকে ঘেরিল—তার দুঃখ-স্পর্শে অশ্রু ফেলিতে লাগিল।

দুই তিন ঘণ্টা পরে, শোকের বেগ একটু প্রশমিত হইল। ক্ষীরদা কাঁদিতে কাঁদিতে বামাচরণের নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সংবাদ শুনিবার পর ক্ষীরদা পর দিবস, সেই স্ত্রীলোক সঙ্গে পদব্রজেই পিত্রালয়ে গমন করিলেন।

বামাচরণ মাসীকে পাইয়া মার শোক অনেকটা ভুলিল। মাসীর স্নেহে মার স্নেহ লাভ করিয়া, বামাচরণ অনেকটা চরিতার্থ হইল।

বামাচরণের মাতৃ শ্রাদ্ধ সমাপন হইলে, বামাচরণ মাসীর সঙ্গে মাসীর মামা শ্বশুরের বাড়ীতে গেল। সেখানে যাইয়া বামাচরণ সকলেরই যত্ন স্নেহ আকর্ষণ করিল। বামাচরণের চেহারাটী বড় স্নেহাকর্ষক ছিল; যে, সে শ্রী দেখিত, সেই না ভাল বাসিয়া থাকিতে পারিত না।

যে দিন বামাচরণ প্রথম মাসীর সঙ্গে তাঁর আশ্রয় স্থানে যাইল; সে দিন সে বাটিতে গিয়া বামাচরণ একটী বন্ধু পাইল; তার নাম গোলাপ সুন্দরী। বামাচরণের তখন বয়স ১৩ বৎসর, গোলাপেরও বয়স তখন তাই—বোধ হয় দুই এক মাস অধিক।

বামাচরণ বড় গল্প করিতে পারিত। যে খানে নূতন যাইত, সে বাটীর স্ত্রীলোক, বালক বালিকা সকলকে গল্প শুনাইয়া মোহিত করিত। মাসীর বাড়ীতে গিয়া বামাচরণ ছাদে বসিয়া গল্প আরম্ভ করিল। কাছে গোলাপ, কামিনী, হরিদাসী প্রভৃতি বসিয়াছে। প্রথম দিনে বামাচরণ মায়াবতীর গল্প বলিল—সকলে হাঁ করিয়া শুনিতে লাগিল। বামাচরণের গল্প শেষ হইলে, গোলাপ একটী বলিল, কিন্তু বামাচরণের মত সেটী হইল না। এইরূপে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে গ্রীষ্মের ফর্‌ফুরে বাতাসে বসিয়া বামাচরণ গল্প বলে, এবং গোলাপ প্রভৃতি শুনে। বামাচরণ একদিন ভূতের গল্প আরম্ভ করিল, শুনিতে শুনিতে সকলে কাছাকাছি হইতে লাগিল। গোলাপ সেই সময়ে আপনার লাবণ্যময় দেহখানি দ্বারা বামাচরণকে স্পর্শ করে—সেই স্পর্শে (জানিনাকেন) গোলাপ এমন একটু আরাম—তৃপ্তি—উদ্দীপনার আঁচ পায়—যাহা সে এ জীবনে কখনও অনুভব করে নাই। এইরূপে বামাচরণ গল্প বলিত, গোলাপাদি প্রাণ মিশাইয়া শুনিত। ২ মাস—৩ মাস পরে গল্প শুনিতে শুনিতে, বামাচরণের মুখ চোখ হাত পা নাড়া দেখিতে দেখিতে, বামাচরণের গল্পে প্রাণ হারাইতে হারাইতে, এক সময়ে দেখিল গোলাপ আপনাকে বামাচরণে যেন হারাইয়া ফিলিয়াছে। ক্রমশঃ এমন হইল যে গোলাপ বামাচরণের আড়ালে থাকায় ক্লেশ বোধ করিতে লাগিল। রাত্রে গল্প বলা সমাপ্ত করিয়া, যখন বামাচরণ প্রভৃতি সকলে ছাদ হইতে উঠিত

গোলাপের উঠিতে বিলম্ব হইত। কখন আবও গল্প শুনিবার জন্ম ঔৎসুক্য প্রকাশ করিত—বামাচরণও গোলাপের অনুরোধে ২।১টী অধিক করিয়া গল্প বলিত। ক্রমশঃ গল্প বলা ও শুনার বাড়াবাড়ি এত হইতে লাগিল যে, বাড়ির লোকের বিনা ধমকে আর থামিতে চায় না।

মাসীর বাড়ীতে থাকিতে থাকিতে মাসীর বাড়ী বামাচরণের বড় ভাল লাগিল। মার শোক একবারে ভুলিল। মাসী তো বামাচরণকে খুব যত্ন করিবেই, আর এক জনের জন্য বামাচরণের আদর আরও বাড়িয়া গেল—সে গোলাপ।

বামাচরণ স্কুলে ভর্ত্তি হইল। পরিশ্রম করিয়া পড়িতে লাগিল। বাটীর বাহিরের ঘরে বামাচরণ পড়িত—বই রাখিত—পাঁচ ছেলের সঙ্গে আলাপ করিত। রাত্রে আহারের পর মাসীর ঘরে শয়ন করিত।

বাহিরের যে ঘরে বসিয়া বামাচরণ পড়িত— সে ঘরে আর একটী বৃদ্ধ বাস করিতেন তাঁর নাম হরিশ্চন্দ্র দত্ত। তিনি গোলাপসুন্দরীর পিতা। বাড়ির কর্ত্তা হরিশ্চন্দ্র, বামাচরণকে খুব স্নেহ ও যত্ন করিতেন। সে ব্যক্তি দিবসে সেই ঘরেই থাকিতেন ঘরের একটী ধারে তাঁর একটী পুরাতন হুকা থাকিত, একটী চকমকির বাক্স থাকত, একটী সরায় কতকগুলি টিকা থাকিত এবং একটী মালায় খানিকটা তামাক থাকিত। হরিশ্চন্দ্র বড় আফিমখোর ছিলেন। ঘরের হুঁকার কাছেই একটী কাঁচের বাটীতে নেকড়া বাঁধা আফিম ভিজান থাকিত। যখন তখন দেওয়ালে ঠেস দিয়াবসিয়া একটী পার উপর আর একটী পা তুলিয়া দিয়া, হুঁকার নলে ঠোঁট দুটী সংলগ্ন করিয়া, ঢুলতে ঢুলিতে তামাকে ধীরে ধীরে টান দিতেন এবং সময়ে সময়ে কোন শব্দ বিশেষের আঘাতে চমকিয়া উঠিতেন।

বামাচরণ আসিবার পূর্ব্বে সে ঘরটীতে হরিশ্চন্দ্র একলাই থাকিতেন। তখন গোলাপ সেই ঘরে আসিয়া বাপের পা টিপিয়া দিত—পাকা চুল উপড়াইয়া দিত—বাতে ধরা কোমরে পাক তৈল মালিশ করিয়া দিত—তামাক সাজিয়া দিত—কখন কখন বা পাখা দিয়া বাপকে বাতাস করিত। বামাচর সেই ঘরে থাকায় গোলাপের বাপের সেবা বাড়িল। বাপ একবার তামা সাজিতে বলিলে, গোলাপ ২বার তামাক না খাওয়াইয়া আর বাড়ীর ভিত

যায় না। বাপ ১০ মিনিট পা টিপিতে বলিলে, গোলাপ আধ ঘণ্টা ধরিয়া বাপের পা টিপিয়া থাকে। গোলাপ বাটীর ভিতরের কাজ কর্ম্ম কমাইয়া বাপের সেবাটী খুব বাড়াইয়া ফেলিল।

বামাচরণ একমনে বই পড়িত, গোলাপ প্রাণ হারাইয়া সেতারের সুরের ন্যায় সেই স্বরে বিমোহিতা হইত। গোলাপের পিতা নেশার ঝোঁকে তামাক টানিতে টানিতে আপনাকে কোন দেশে হারাইয়া ফেলিত, গোলাপও পিতার পা টিপিতে টিপিতে বা পাকা চুল উপড়াইতে উপড়াইতে কাহার কণ্ঠ মাধুর্য্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিত।

স্কুলে যাইবার সময় না হইতে হইতে, গোলাপ বামাচরণের ভাতের তাড়া দিত; খাবার যায়গা করিয়া রাখিত; পান সাজার ভার গোলাপের হাতে থাকায়, গোলাপ বামাচরণের জন্য ভাল মসলা দেওয়া পান আগে সাজিয়া রাখিত। বামাচরণের ভাত খাইবার সময়ে গোলাপ তাহার কাছে কাছে পাইচারী করিত, তাহার হাতের দিকে মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত, না চাহিতে চাহিতে আপনি গিয়া রান্নাঘর হইতে তরকারী ভাত আনিয়া দিত—দু খানা আলু ভাজার যায়গায় বামাচরণ ৪ খানা, দু খানা মাছের চাকার স্থলে বামাচরণ ৪।৫ খানা পাইত। বামাচরণের ভাত খাওয়া না হইতে হইতেই, গোলাপ পানটী হাতে করিয়া কাছে দাঁড়াইয়া থাকিত। হাতে পান দিবার সময় গোলাপ হৃদয়ের যেন খানিকটা তার সঙ্গে ঢালিয়া দিত—সে সময়টী গোলাপের বড় দামী সময় হইত—সে সময়ে গোলাপের দৈনিক সুখের ফুলটী যেন ফুটিয়া গোলাপকে গোলাপী সৌরভে বিমুগ্ধা করিত।

বামাচরণ পড়িবার ঘরে জিনিস পত্র বড় অযত্নে রাখিত। কোন বই খানা দেরাজের এক স্থানে উল্টিয়া—কোনটা বা একপেশে হইয়া থাকিত—আলনায় চাদর কাপড় জামা, বড় বিশৃঙ্খল ভাবে থাকিত। বামাচরণ একদিন স্কুল হইতে আসিয়া দেখিল তার পুস্তকগুলিকে সুন্দররূপে গুছাইয়াছে, আনালায় কাপড়গুলিকে কুচাইয়া রাখিয়াছে। বামাচরণ ভাবিয়াছে তার মাসী, কিন্তু সেটী তার ভুল। বামাচরণ তার পর প্রত্যহই ঐরূপ দেখিত।

বামাচরণের পদার্পণের পর হইতে, গোলাপ বামাচরণের মাসীকেও খুব বড় শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। আপনার মার মত তাঁকে ভক্তি করিতে থাকিল।

বামাচরণ মাসীর কাছে থাকিয়া খুব লেখাপড়া করিতে লাগিল। যত্ন আদরের সতর আনা পাইতে থাকিল। বামাচরণের ৫.৬ মাসের মধ্যে বেশ গায়ে মাংস গজাইল—মুখ খানি ঈষৎ লাল হইল। সেই আশ্রয়ে বামাচরণ ছয় বৎসর কাটাইল। ছয় বৎসরে বিনামূল্যে বিনাপরিশ্রমে অজ্ঞাতসারে গোলাপ সুন্দরীকে আপনার হাড়ের ভিতরে পুরিয়া ফেলিল। যেমন মানুষ তার শরীরের ভিতরের প্রাণ বায়ুকে চিনে না, কিন্তু তাহা শরীরেই থাকে, সেইরূপ বামাচরণ গোলাপকে না চিনিলেও তাহার জীবনের প্রাণ বায়ুরূপে গোলাপ কার্য্য করিতে লাগিল। তা না হইলে, বামাচরণ গোলাপের মার জ্বালায় তিষ্টিতে পারিত না—আশ্রয় বিহনে হয় তো অনাহারেই মারা যাইত। কিন্তু গোলাপ বামাচরণের জীবন পথ, আপনার হৃদয়ের কোমলতা দ্বারা গড়িয়াছিল—সেই পথের দুধারে কত যেন ফুল গাছ বসাইয়াছিল।

ছয় বৎসর সেখানে বামাচরণ থাকিয়া—এন্ট্রান্স পাশ করিল। তার পর এফ্, এ পড়িতে লাগিল। চারি দিক হইতে সম্বন্ধ আসিতে থাকিল। গোলাপ ক্ষীরদার কাছে সর্ব্বদা বামাচরণের বিবাহের কথা কহিত। বামা-চরণকে কাছে দেখিতে পাইলে, সে কথাটী জোরের সহিত কহিয়া তাহার মন বুঝিতে প্রয়াস পাইত। বামাচরণ কিছু বলিত না—চুপ করিয়া থাকিত—কখন ফুলের পাপড়ির কোলের হাসির মত একটু মাত্র মুচকিয়া হাসিত। সে হাসিটুকু গোলাপের হাড়ে—রক্তে মিশিয়া গোলাপকে তৃপ্তির চরমসীমায় উপনীতা করিত। সেই হাসি, মদ্যের ন্যায় গোলাপ পান করিয়া, আনন্দের নেশায় যেন ডুবিয়া থাকিত—হাড়ে মাসে সে হাসি জড়াইয়া রাখিত।

গোলাপের ৯ বৎসরে বিবাহ হয়। ১০ বৎসরে পড়িয়া, গোলাপ সধবা নামে বঞ্চিতা হয়। গোলাপের শ্বশুর বাড়ীতে আর কেহ ছিল না। স্বামীর কতকগুলি টাকা পায়; তাহা তার পিতা—হরিশ দত্ত, ব্যাঙ্কে জমা দিয়া রাখিয়াছিল। গোলাপের বয়স যখন ১৫ বৎসর হয়, তখন গোলাপ সে টাকা হস্তগত করিয়া মহাজনি করিতে থাকে। গহনা বন্ধক রাখার কার-বার খুলিয়া বেশ দশ টাকা সুদের দরুণ পাইতে থাকে।

এখন বামাচরণের নানাস্থান হইতে সম্বন্ধ আসায়, ক্ষীরদা ভাবিল, বিবাহ কোথায় দেব ? গোলাপকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে, গোলাপ সেই বাড়ী-তেই বিবাহ দেওয়া যুক্তি সঙ্গত বলিল। গোলাপের যত্নে গোলাপের মা বাপেরও মত হইল। বামাচরণের সেই বাড়ী হইতেই বিবাহ স্থির হইল। গোলাপ লুকাইয়া বামাচরণের মাসিকে কিছু টাকা দান করিল।

বামাচরণের বিবাহের সময় গোলাপ খুব খাটিতে লাগিল। তবে এক একবার প্রাণের গুপ্ত স্থলে এক একটী কিসের প্রবল বন্যা আসিতে লাগিল—বুকটী কি একটী যাতনায় ফাটিতে থাকিল—কি যেন পাইত পাইবে না ভাবিয়া—মাঝে মাঝে পৃথিবীতে মিশিবার ইচ্ছা হইতে লাগিল। গোলাপ অনেক যত্নে—অনেক বলে—বামাচরণের চরণে আপনার সমুদয় দুঃখ সুখ ও আশাকে বলিদান দিয়া—সে সব ভাবকে দমন করিতে লাগিল। এক এক-বার মনটী যেন পাগলিনীর মত হইয়া যায়, আবার অনেক কষ্টে মনকে আয়ত্ত করে। এইরূপে গোলাপের মনে একটী ভয়ানক যুদ্ধ গুপ্তভাবে চলিতে থাকিল। তাহা কেহ জানিল না। যে দিন বামাচরণ বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক আসিল—সে দৃশ্যটা দেখিবামাত্র গোলাপের মাথার মগজ—বুদ্ধি—স্মৃতি সব যেন উপিয়া গেল—ধরা যেন অন্ধকারময়ী দেখিল ; গোলাপ আপনার শয্যায় মুখ গুঁজিয়া একটী কি যেন মহাশত্রুকে বধ করিবার প্রয়াস পাইল, কিন্তু পারিল না। গোলাপের বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিল—গোলাপ প্রকৃত রূপই উন্মা-দিনী হইল। সে উন্মাদ রোগের আর কিছু চিহ্ন দেখা গেল না—কেবল এই মাত্র দেখা গেল যে, গোলাপ আপনার ঘরের প্যাটরা হইতে আপনার বিবাহের চেলীর শাটীখানি পরিয়া, মাথায় ঘোমটা দিয়া বসিয়া, খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে। সে, ঘরে কেহ প্রবেশ করিলে, কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিত 'মনে করে ছিলাম তুমি বুঝি বামাচরণ।' বলিয়াই কোন কোন সময়ে কাঁদিতে থাকিত—আবার কোন কোন সময়ে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিত।

গোলাপের ভাব গতিক দেখিয়া অনেকে কাণা কাণি করিতে লাগিল। অনেকে বুঝিল বামাচরণের সহিত গোলাপের ভিতরে ভিতরে কিছু হইয়া থাকিবে।

বিবাহের ৮ দিন পরে 'ক'নে' পিত্রালয়ে গমন করিল। গোলাপের ও রোগ কমিতে থাকিল। ১৫।১৬ দিনের মধ্যেই, গোলাপ চেলীর কাপড় খুলিল—প্রকৃতিস্থা হইয়া সংসারে কাজ কর্ম্ম করিতে লাগিল।

একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়, গোলাপ ভাবিতে লাগিল। আমি বামাচরণে যেরূপ আসক্তা হইয়াছি, তাহাতে ভয় হয়, পাছে লোকে জানিতে পারিয়া কলঙ্কের রটনা করে। আমি বালবিধবা। এখন প্রায় ১৭ বৎসর বয়স হইয়াছে। আমার আর ওসব ভাবা কেন? প্রণয়ের মুখে এখন আগুণ দিয়া, বুড়ির মত হরি নাম করাই ভাল। মনটা অন্য দিকে গেলে, ওরোগটা যাবে বোধ হয়। এইরূপ অনেক ভাবিয়া, গুরুমন্ত্র গ্রহণ করা উপযুক্ত স্থির করিয়া, বাপের কাছে তাহা জানাইল। বাপ শুনিয়া মহা খুসী হইল।

গুরু আসিয়া গোলাপের কাণে মন্ত্র দিল। গোলাপ মন্ত্র লইবার পর, সন্ধ্যায় হরিনামের মালা লইয়া জপিতে বসিল। মনে মনে বলিল 'হরি', প্রাণ চক্ষে দেখিল—বামাচরণ হাসিতেছে। আবার মনকে গালি দিয়া চক্ষু মুদিয়া ভাবিল 'হরি জগতের কর্ত্তা, তাঁহা হতে সকলের উৎপত্তি', অমনি চড়াৎ করিয়া সেই এক দিনের বামাচরণের মুখের হাসি, তড়িত-তরঙ্গের ন্যায় গোলাপের হৃদয় আলোকিত করিয়া চলিয়া গেল। গোলাপ কাঁদিতে কাঁদিতে হরিনামের মালা তুলিয়া রাখিল। চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল:—"আমি যত ভুলিতে যাই ততই মনে পড়ে; আমার আর হরিনাম জপা বৃথা। প্রাণটার অনেক কথা আছে—কার কাছে সে কথাগুলা বলিব? বোধ হয় বামাচরণের কাছে সে গুলা বলিলে মনটা স্থির হবে।" আবার ভাবিল, "বামাচরণ আমাকে ভগিনী বলিয়া জানে, 'গোলাপ দিদি' বলিয়া ডাকে, আমি কোন লজ্জায় প্রাণের কথা খুলিয়া বলিব। না না বলিব না। অদৃষ্টে যাহা আছে হবে।' গোলাপ চুপ করিয়া ১০।১২ দিন কাটাইল—কিন্তু সে কথাগুলা বলিবার জন্য গোলাপের প্রাণে এত লালসা জ্বলিতে লাগিল যে, সে জ্বলনে গোলাপ আপনাকে পাগলিনীর মত অনুভব করিতে থাকিল। গোলাপ ভাবিল: না—আমি কি অবার পাগলিনী হব নাকি? না—তা আর হবে না—পাগলিনী হইয়া যদি আর আরাম না হই। তাহা অপেক্ষা লজ্জায় মাথা

খাইয়া বলা ভাল। আজ রাত্রে বলিবার সুযোগ খুঁজিব। রাত্রে সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে গোলাপ দ্বিতল হইতে উন্মাদিনীর মত নিম্নে আসিল। বাহির বাটীর বামাচরণের ঘরের কাছে আসিয়া দেখিল, বামাচরণ তখনও বিড় বিড় করিয়া আলোকে পড়িতেছে। ইচ্ছা দ্বারে ধাক্কা মারে—প্রথম বারে দ্বারের কাছে ক্ষণকাল দাঁড়াইল—দাঁড়াইবাই আছে—ধাক্কা মারিবার জন্য হাত তুলিয়াও মারিতে লজ্জা হইল। গোলাপ—লজ্জাকে দূর করিল। দ্বারে টুক্ টুক্ করিয়া শব্দ করিল—বামাচরণ তাহা শুনিতে পাইল না। গোলাপ—এবারে জোরে ধাক্কা মারিল। কবাট অমনি খুলিয়া গেল। বামাচরণ চাহিয়া দেখিল—সম্মুখে বিদ্যুৎবরণী গোলাপ সুন্দরী। দেখিবা মাত্র বামাচরণের শোণিত প্রবাহ চমকিয়া উঠিল—হতবুদ্ধির মত জিজ্ঞাসা করিল, গোলাপ! কি? বাড়িতে কি কাহারও ব্যারাম?

গোলাপ উত্তর দিল না—আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। বামাচরণের মন বিস্ময়ে অভিভূত হইল—গোলাপের অনেক কথা মনে পড়িল। বামাচরণ একদৃষ্টে গোলাপের মুখের দিকেতাকাইয়া দেখিল—গোলাপ অজস্র-অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। তেমন সুন্দর মুখে তত অশ্রুধারা প্রদীপালোকে চক্ চক্ করিতেছে দেখিয়া, বামাচরণের প্রাণের বাঁধন এলাইয়া পড়িল। বামাচরণ তখন গোলাপকে পূর্ব্বের ভাবে না দেখিয়া, অন্য একটা বড় উন্মাদক ভাবে দেখিতে লাগিল। গোলাপের চক্ষে জল দেখিয়া বামাচরণ কাঁদিয়া ফেলিল। বামাচরণ কাঁদিতে কাঁদিতে গোলাপের হাত ধরিল—ধরিয়া ক্রোড়ের দিকে আকর্ষণ করিল—আকর্ষণ করিবামাত্র গোলাপ লজ্জাবতী লতিকার মত বামাচরণের ক্রোড়ের কাছে গুটাইয়া মুখ হেঁট করিয়া বসিল; একটী ভারি দীর্ঘ শ্বাস ছাড়িয়া বামাচরণের বুকের হাড়ে চাপ দিল। বামাচরণ জড়িতস্বরে বলিল 'কেন? কি মনে করে?

গোলাপ— উত্তর দিবার প্রয়াস পাইয়াও পারিল না। বামাচরণ আবার জিজ্ঞাসা করিল, গোলাপ। কি মনে করে?

গোলাপ চুপে চুপে কি বলিল—বামাচরণ বুঝিতে পারিল না। গোলাপ সেই সময়ে চেতনাশূন্যার ন্যায় বামাচরণের ক্রোড়ের উপর পড়িয়া গেল। বামাচরণ ধীরে ধীরে, প্রেমোৎফুল্ল হইয়া, গোলাপের

গোলাপী কপোলে একটী চুম্বন করিল। সেই চুম্বনস্পর্শে—গোলাপের প্রাণে অমৃত স্রোত বহিল—গোলাপের অচৈতন্যের ভার কাটিল—গোলাপ চক্ষের দুটী পল্লব তুলিয়া বামাচরণের মুখের দিকে তাকাইয়া, সেই মুখের—সেই চক্ষুর—সেই শ্মশ্রু ও গুম্ফের সৌন্দর্য্য পান করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, গোলাপ ধীরে ধীরে বলিল 'আমার আশা মিটিয়াছে এখন যাই"। তখন গোলাপের প্রাণের কয় বৎসরের যাতনা বামাচরণের চুম্বনে দ্রবীভূত হইয়াছে—বামাচরণ-সম্ভোগে গোলাপের উন্মাদ রোগের বীজ নষ্ট হইয়াছে। গোলাপ হাসিতে হাসিতে বামাচরণকে দু বাহুতে আলিঙ্গন করিয়া, মুখে কয়েকটী চুম্বন দিয়া আপন কোমল অঙ্গের কোমলতা প্রবাহ বামাচরণের অস্তিত্বে প্রবাহিত করিতে লাগিল। একটী—দুইটী—তিনটী চুম্বনের পর, অনেক কষ্টে মুখ খানি বামাচরণের মুখ হইতে সরাইতে প্রয়াস পাইতে পাইতে—খানিকটা অশ্রুজল বামাচরণের মুখে ফেলিয়া—যেন অবশিষ্ট দুঃখাংশ ঝাড়িয়া ফেলিল। বামাচরণ সাশ্রু নয়নে বলিল "সব জানি—বুঝি—কিন্তু নিরুপায়"।

গোলাপ একটু কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল "আর আসিব না—আমার মনস্কামনা পুরিয়াছে, এখন তুমি সুখে থাকিলেই আমার সুখ"। বলিয়াই প্রকৃতিস্থা হইয়া বামাচরণের স্বর্গকোল পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া গৃহাভিমুখে চলিল। বামাচরণ অবাক হইয়া অশ্রুমোচন করিতে থাকিল।

সেই রাত্রে গোলাপ আপনার প্রাণের অনেক বৎসরের গুপ্তজ্বালা সুশীতল করিয়া আপনার ঘরে গিয়া শয়ন করিল। আর কেহ সে কথা জানিল না। তার পর গোলাপ বেশ মন দিয়া কাজ কর্ম্ম করিতে লাগিল। হরিনামের মালা জপিবার সময় কোন বাধা আসিত না—মন হরি নামে খুব মজিয়া যাইত। তা বলিয়া কি গোলাপ বামাচরণকে ভুলিয়াছিল? না—তাহা নহে। কেননা গোলাপ অবসর পাইলে আপনার মনটীকে প্রায়ই বামাচরণের জন্য নানা ভাবনায় ব্যস্ত রাখিত। বামাচরণ কিসে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে—বামাচরণের দুরবস্থা কি প্রকারে ঘুচিবে—ইত্যাদি ভাবিত।

বামাচরণ আর অধিক দিন গোলাপদিগের বাটীতে থাকিল না। তার কলিকাতায় কোন অফিসে চাকুরি হইল। বামাচরণ সেই চাকুরির জন্য

মাসির আশ্রয় এবং গোলাপের স্নেহই বল বা গুপ্ত ভালবাসাই বল, ছাড়িতে বাধ্য হইল। তার পর, কিছুকাল চাকুরী করিয়া বামাচরণ আপনার পৈতৃক ভিটায় বাড়ী করিল। আপনার আর কোন অভিভাবক না থাকায়, মাসীকে গোলাপের বাপ মাকে বলিয়া, আপনার ঘরে লইয়া গেল।

গোলাপ বামাচরণের বাড়িতে মাঝে মাঝে যাইত। গিয়া বামাচরণের ছেলে মেয়ের প্রাণ দিয়া সেবা করিত—বামাচরণের স্ত্রীকে আপনার ভগিনীর ন্যায় ভাল বাসিত।

বামাচরণের স্ত্রীর নাম সৌদামিনী। সৌদামিনীর যত্ন আদর করিয়া গোলাপ যেন আপনারই যত্ন আদর করিত। সৌদামিনীর হাসিতে গোলাপ আপনার হাসি দেখিত, সৌদামিনীর দুঃখে গোলাপ কাঁদিয়া মরিত। গোলাপ, যে কয় মাস, বামাচরণের বাটীতে থাকিত, সে কয় মাসে বামাচরণের স্ত্রীর ও ছেলেদিগের রঙ উজ্জ্বলতর হইত—চোখের কোলে রক্ত গাঢ় হইত—গায়ে মাংস গজাইত। গোলাপ চলিয়া গেলে তাহারা একটু যেন কাহিল হইত।

গোলাপ সৌদামিনীকে বড় কাজ কর্ম্ম করিতে দিত না। বামাচরণের ছেলে মেয়ে, গোলাপ আসিলে হাতে হাতে স্বর্গ পাইত—তার কাছ ছাড়িয়া আর কারও কাছে ঘুমাইত না। গোলাপ না খাওয়াইলে তাদের পেট ভরিয়া খাওয়া হইত না—গোলাপ না ঘুম্ পাড়াইলে তাহাদের ঘুম আসিত না। তারা গোলাপের কথায় দুষ্টামি ছাড়িত—কাঁদিতে কাঁদিতে থামিত। গোলাপ সৌদামিনীর গা মাজিয়া দিত—চুল বাঁধিয়া দিত—বামাচরণের মন ভুলাইবার—মনে স্বস্তি দিবার উপায়—উপদেশ বলিয়া দিত। সৌদামিনী সে কথা এড়াইতে পারিত না।

বামাচরণ মাঝে মাঝে ভাবিত, গোলাপ পূর্ব্বকার সব কথা ভুলিয়াছে। তাই সে খুব সাবধানে চলিত। আপনার বাটীতে গোলাপ থাকিবার সময় ঠিক ভগিনীর মতই দেখিত।

৩।

গোলাপ বাপের বাড়ীতে আছে। হঠাৎ একদিন সকালে হরিশ্চন্দ্র দত্ত বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল। স্ত্রীকে ডাকিল। গোলাপ সেখানে দাঁড়া-

ইয়াছিল। হরিশ্চন্দ্র গোলাপের মাকে ডাকিবামাত্র, গোলাপের প্রাণটার ভিতর হু হু করিয়া উঠিল—ডান চক্ষু নাচিয়া উঠিল। গোলাপ ভাবিল, ভাল কথা নয়—কি সর্ব্বনাশ হল? হরিশ্চন্দ্র স্ত্রীকে বলিল 'আর সর্ব্বনাশ হয়েছে! বামাচরণ কাল মারা গেছে'।

শুনিবামাত্র হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রী কাঁদিয়া ফেলিল—অনেক আক্ষেপের কথা বলিল।

গোলাপ তখন আস্তে আস্তে অবনত মুখে, ধীরে ধীরে ভারি ভারি পা ফেলিয়া আপনার ঘরের ভিতরে গেল। ঘরে খিল আঁটিল। ধড়াস করিয়া মেজের উপর পড়িয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকিল—শোকটা বড় গভীরতম তাই চক্ষে জল আসিল না, আসিবে কি—সে জল ভিতরের উত্তাপে শুখাইয়াছে। গোলাপ অনেকক্ষণ নীরবে মেজের পানে মুখ গুঁজিয়া পাথরের মত পড়িয়া থাকিল। গোলাপের মা কপাটে ঠেলা দিল—কপাট খোলে না দেখিয়া গোলাপকে ডাকিল। শাড়া পাইল না। আবার ডাকিল, তথাপি শাড়া পাইল না। গোলাপের বাপ আসিয়া অনেক ডাকিল—কপাটে ধাক্কা মারিল—গোলাপ শাড়া দিল না—কপাট বন্ধই থাকিল। তাদের তখন ভয় হইল। কামার ডাকাইয়া কবাট খুলাইল। খুলাইয়া দেখিল, গোলাপ শুইয়া আছে—শাড়া নাই নড়ন নাই। গোলাপের মা কাছে গিয়া দেখিল গোলাপ চৈতন্য রহিতা। গোলাপের মার বুক কাঁপিয়া উঠিল। হরিশ্চন্দ্র হাত দেখিল—ধাতু আছে। তখন বুঝিল গোলাপের মূর্চ্ছা হইয়াছে। অনেক যত্নে মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইল। গোলাপ উঠিয়া বসিল—কিন্তু কাহারও সহিত কথা কহিল না—কাহারও দিকে তাকাইল না—কাহারও প্রশ্নের উত্তর দিল না, কেবল আকাশের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইতে লাগিল—মাঝে মাঝে এক একটী হা হুতাসের দীর্ঘ শ্বাস ছাড়িয়া, যেন প্রাণবায়ু বাহির করিবার প্রয়াস পাইতে থাকিল।

গোলাপের বাপ কিছু বুঝিতে না পারিলেও গোলাপের মা একটু বুঝিল।

গোলাপ কিছু খাইল না। খাইতে বসিয়াছিল বটে কিন্তু মনের যাতনায় ভাল লাগিল না—মার মনে প্রবোধ দিবার জন্য একবার আহারের সঙ্গে আলাপ করিল মাত্র। তার পর বিছানায় শয়ন করিল। চক্ষু মুদিয়া

আঁধারে ডুবিল—ডুবিয়া বামাচরণকে যেন হাতড়াইতে থাকিল। তার এক একটা কথা, এক একটা হাসি, সেই আঁধারে বিদ্যুতের মত—বজ্রের মত খেলা করিতে লাগিল। গোলাপ সে সব দেখিতে দেখিতে আপনাকে বামাচরণে পরিণত করিল। গোলাপ আর গোলাপ নাই—বামাচরণে গঠিতা হইয়া, বামাচরণের স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদির জন্য ভাবিয়া আকুলা হইল—চারিদিক হইতে যাতনার চাপে অভিভূতা হইয়া, নীরবে প্রণয়ের গলায় যেন গলা রাখিয়া, একটা নূতন নীরব জগতে ডুবিয়া থাকিল।

সন্ধ্যা আসিল—তাহাও অতীত হইল। জননী কাছে বসিল—ভাল কথায় তার মনোরঞ্জনের প্রয়াস পাইল। কিন্তু সমুদ্র মুষ্টিমেয় মৃত্তিকায় যেমন সমুদ্রের জল শুকায় না—জননীর চেষ্টা যত্ন ও তদ্রূপ হইল। জননী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে, গোলাপের বৈধব্য-স্মৃতি-যন্ত্রণায় কাতরা হইয়া, চখের জল ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া গেল। ক্রমশঃ রাত্রি অনেক হইল। বাহিরের অন্ধকারের সহিত গোলাপের হৃদয়ান্ধকারের একতা হইল—বাহিরের আকাশের সহিত গোলাপের প্রণয়াকাশের মিলন হইল। প্রকৃতির ভার, শোকা-কারে গোলাপের প্রাণের উপরে চাপ দিতে থাকিল। দেখিতে দেখিতে গোলাপ বিছানা হইতে উঠিল। যখন উঠিল—তখন তার হাতের ভিতরে বামাচরণের হাত—চখের ভিতরে বামাচরণের চোখ—প্রাণের ভিতরে বামাচরণের প্রাণ। গোলাপ তখন বামাচরণের ভাবনা হৃদয়ে বসাইয়া ভাবিল, সৌদামিনীর কি দশা—ছেলেগুলির কি দুর্দ্দিন! আর আমি থাকিব না। বিছানায় থাকা শোভা পায় না। সেই শ্মশানে—সেই ভস্মরাশিতে—যে খানে বামাচরণ চিরনিদ্রিত, সেই নিদ্রার ভিতরে বামাচরণের সঙ্গে মিশিতে পারিলে প্রাণের তৃপ্তি—দুর্দ্দশার শান্তি।

তখন রাত্রি ছিল। চারিদিকের গাছ পালা পথ ঘাট আকাশ, আঁধা-রের স্বপ্নস্রোতে ডুবিয়া এক অভিনব কাব্যরসে আর্দ্র হইতেছিল। গোলাপ ঘরের বাহির হইল। দ্বারের পর দ্বার খুলিয়া, সদর রাস্তায় পড়িল। প্রাণের ভিতরে কি একটা তেজ গোলাপকে বামাচরণের প্রাণের দিকে ঠেলিতে থাকিল। গোলাপ পথ চিনিত—সেই দিকে চলিল। উন্মা-দিনী, চারিদিকে উন্মাদকতা ছড়াইতে ছড়াইতে, অবশেষে বামাচরণের গ্রামে

উপস্থিত হইল। তার পর বামাচরণের গৃহ দেখিল—আর সেদিকে যাইতে পারিল না। শ্মশানের দিকে চলিল। কত লোক সেই দেহের চলনের দিকে তাকাইল—কত পুরুষ সেই সুশ্রীবদিকে তাকাইয়া প্রাণ হারাইতে থাকিল। গোলাপ শ্মশানে চলিল। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সেই নূতন চুল্লী চিনিল। চুল্লীর কাছে বসিল। কত কি ভাবিল। কত কাঁদিল। কত দীর্ঘশ্বাস ছাড়িল। আবার ভাবিতে ভাবিতে উঠিল। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। উঠিয়া সেই চুল্লীর উপরে কিয়ৎক্ষণ শয়ন করিল। অশ্রুজলে চুল্লীর কয়লা আর্দ্র করিল। শুইয়া তার ভিতরে একটু উত্তাপ অনুভব করিল। তখন বিদ্যুতের ন্যায় একটা ভাব চড়াৎ করিয়া হৃদয়ে খেলিল। সে ভাবটা বলিল, "আর কেন—শ্মশানে স্বামীর চুল্লীর আগুণে কাষ্ঠ লাগাইয়া তাহাতে এদেহ ভষ্মীভূত কর। যে বামাচরণের জন্য তুমি পাগলিনী, সে আজ ভস্মরাশির ভিতরে প্রচ্ছন্ন, সেই ভস্মে তুমি সোণার দেহকে পরিণত কর—ভস্মের ভিতরে বামাচরণের প্রেমালিঙ্গন পাইবে।" ভাবটা আসিবা মাত্র, গোলাপ শোকটা ছুঁড়িয়া ফেলিল—ভিতর হইতে বামাচরণের প্রেমাহ্বান শুনিতে লাগিল। চুল্লী হইতে উঠিল। শ্মশানে অনেক পোড়া কাষ্ঠ বিক্ষিপ্ত ছিল। গোলাপ সেগুলিকে একত্র করিল। শুষ্ক পত্র সংগ্রহ করিয়া সেই চুল্লীর আগুণে ধরাইয়া ফেলিল। তাহাতে সেই কাষ্ঠ দিবামাত্র তাহারা জ্বলিয়া উঠিল। গোলাপ সেই প্রজ্বলিত হুতাশনের দিকে তাকাইয়া, সেই হুতাশন শিখায় যেন কাহাকে দেখিতে পাইল—তার ভিতর হইতে কে যেন বলিল "গোলাপ গোলাপ। আমার কাছে এস"। শুনিতে শুনিতে জগৎ ভুলিয়া গেল—আপনাকে ভুলিল। তখন জগতের চারিদিকে অসংখ্য বামাচরণ মূর্ত্তি সৰ্জ্জিত দেখিল—চুল্লীর ভিতরে বামাচরণের আরামের নিকেতন অনুভব করিল—আর দাঁড়াইতে পরিল না। কাঁপিতে কাঁপিতে "প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বর" বলিতে বলিতে, সেই প্রজ্বলিত হুতাশনে দেহ বিসর্জ্জন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই সোণার দেহ অঙ্গার রাশিতে মিশিয়া গেল।

———o———

ব্রহ্মপিসী।

ব্রহ্মপিসী বিধবা হইবার পূর্ব্বে কেবলমাত্র গ্রামের নসিরাম চট্টোপাধ্যায়ের পিসী ছিলেন। বিধবা হইয়া শ্বশুর বাটী হইতে তাঁহার আড্ডা তুলিয়া, পিত্রালয়ে ভাইপোর সংসারে গিন্নি হইয়া বসিলে, কয়েক বৎসরের মধ্যে নসিরামের পিসী, গ্রাম শুদ্ধ লোকের পিসী হইয়া পড়িলেন। এটা যেন তাঁর একটা খেতাব বা টাইটেলের মধ্যে পড়িয়া গেল। নাম ব্রহ্ম, খেতাব হইল পিসী—সর্ব্বশুদ্ধ ব্রহ্ম পিসী। পাড়ার যে সম্পর্কে নাতি নাতিনী ভাই ভগিনী; তারা পর্য্যন্ত ব্রহ্মপিসী বলিতে লাগিল। তবে বিজ্ঞেরা সাক্ষাতে উপযুক্ত সম্পর্ক অনুসারেই সম্বোধন করিতেন, কিন্তু আড়ালে কথাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মপিসী বলিতেন। কালক্রমে ব্রহ্মপিসীর নামটী গ্রাম পার হইয়া গ্রামান্তরে পঁহুছিল। ১০।১২ খানা গ্রামে ব্রহ্ম পিসী প্রসিদ্ধা হইলেন অর্থাৎ এক সময়ে ব্রহ্ম ১০।১২ খানা গ্রামের পিসী হইলেন।

ব্রহ্মপিসীর গুণই অধিক ছিল। যে সময়ে ব্রহ্মপিসী—নামের খুব ছড়াছড়ি, সে সময়ে ব্রহ্মপিসীর চুল পাকিয়াছে, ৪।৫টী দাঁত পড়িয়াছে। হেঁট্ হইয়া দক্ষিণ হস্তে বাড়ি ধরিয়া হাঁটেন। গঙ্গা হইতে ২ ক্রোশ দূরে বাটী ছিল, কিন্তু ব্রহ্মপিসী ভোরে উঠিয়া তৈল মাখিয়া বগলে পরিবার থান ধুতি লইয়া যষ্টি হস্তে প্রত্যহ গঙ্গা স্নান করিতে যাইতেন। স্নান করিতে যাইবার পূর্ব্বে বাটীর উঠানটী ঝাঁট দিয়া, তার পর, চৌকাট হইতে আরম্ভ করিয়া বাটী হইতে ৩০।৪০ হাত দূর পর্য্যন্ত পরিষ্কার করিতেন। তুলসী-তলাটী ভাল করিয়া নিকাইতেন। গঙ্গা স্নান করিয়া প্রফুল্ল মনে হরি হরিধ্বনি করিতে করিতে সূর্য্যোদয়ের কিয়ৎক্ষণ পরেই গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। বৃদ্ধ বয়সেও ব্রহ্মপিসীর গায়ে খুব জোর ছিল; বাড়ি হাতে লইয়া দ্রুত বেগে চলিতে পারিতেন।

ব্রহ্ম পিসী নানারূপ তুক্ তাক্ জানিতেন। কোথায় যাইতে হইলে তুক্ করিয়া বাহির হইতেন, তাহাতে বিপদের সম্ভাবনা থাকিত না। ব্রহ্মপিসী টোট্‌কা ঔষধ নানাপ্রকার জানিতেন। ঝাড়ন মন্ত্র অসংখ্য শিখিয়াছিলেন। তাঁর শয়নের ঘরের কোন স্থানে নানাবিধ শিকড়, কোন স্থানে সাপের খোলস,

টিক্‌টিকির ল্যাজ, হ্রিয়লের ডিম্, কোনস্থানে নানাবিধ কড়ি পরিপূর্ণ থাকিত। তাঁর বাটীর ভিতরে উঠানে একটী বড় তুলসী গাছ ছিল, সেই তুলসী তলে বসিয়া ব্রহ্মপিসী কখন পা মেলিয়া ভেঁা ভেঁা ভেঁা শব্দে চরকা কাটিতেন, কখন ঔষধের বকাল কুটিতেন। আবার কুলের আমের জামের আমড়ার আচার প্রভৃতি চাটনি প্রস্তুত করিতে ব্রহ্ম পিসীর মত কেহ পারিত না। রান্নায় ব্রহ্ম পিসী ১০।১২ খানা গ্রামের মধ্যে অদ্বিতীয়া ছিলেন। শ্রাদ্ধ বাড়ীতে—বিবাহ বাড়ীতে ব্রহ্ম পিসী না আসিলে যজ্ঞের আস্বাদন করিয়া যাইত। যজ্ঞটা যেন আলুনি হইত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ব্রহ্ম পিসী নানাবিধ ঔষধ মন্ত্রাদি জানিতেন। শক্ত শক্ত রোগ কবিরাজাদি সুচিকিৎসকগণ যাহা আরাম করিতে পারিতেন না, ব্রহ্ম পিসী হাসিতে হাসিতে দুটী পৃষ্ঠে ফুঁ দিয়া, বা পান্তা ভাতের সহিত কোন একটা শিকড় বাঁটিয়া খাইতে দিয়া, আরাম করিতেন। প্লীহা যকৃতের রোগী যমালয়ের দ্বারের নিকট আসিয়াছে—ব্রহ্মপিসী মুড়ি পড়া খাওয়াইয়া যমদ্বার হইতে ফিরাইতেন। বড় আমাশয়ে প্রাণ যায় যায় হইয়াছে—ব্রহ্মপিসী কি একটা মাদুলি ধারণ কবিতে দিলেম, আব যা ইচ্ছা তাই খাইতে বলিলেন; রোগীও অল্পদিনের মধ্যে জিলিপি কচুরি কড়াইভাজা প্রভৃতি খাইতে খাইতে হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ হইয়া উঠিলেন। সাপের বিষ যেরূপ উগ্র হউকনা কেন, ব্রহ্মপিসী তিন চাপড়ে ও তিন ফুঁয়ে নামাইতে পারিতেন।

এই সকল গুণ থাকায় দেশ বিদেশ হইতে রোগী আসিত—ব্রহ্মপিসীর নিকট ঔষধাদি লইত। এই সকল চিকিৎসার জন্য ব্রহ্মপিসী পয়সা লইতেম না। তবে ঔষধাদি দিবার সময় বলিতেন, আরাম হইলে আমার বাটীর অন্নপূর্ণার কিছু পূজা দিও। সেই পূজার আয়ে ব্রহ্মপিসীর ঔষধাদির খরচ পত্রাদি চলিত। কিন্তু একটী পয়সা নিজে ব্যয় করিতেন না—তাঁর বিশ্বাস ছিল ও পয়সা পেটের জন্য খরচ করিলে ঔষধের আর গুণ খাটিবেনা—ঔষধ ভোযা হইবে। আজ কাল যে সকল স্ত্রীলোক চিকিস্যাশাস্ত্র শিখিয়াছেন তাঁহারা ব্রহ্ম পিশীর পদধূলি গ্রহণ করুন এবং লজ্জায় মুখ হেঁট করিয়া বাববার পৃথিবীর ধুলায় মিশিতে প্রার্থনা করুন। ভগবান! কি ভারতবর্ষ কি হইতেছে!!

আজকালের বাজারে যদি ব্রহ্মপিসী থাকিতেন তো মনে করিলে, সংবাদ-

পত্রে ঔষধের বিজ্ঞাপন দিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন। কিন্তু সেকালের স্ত্রীলোকদিগের ধর্ম্ম বিশ্বাস এত প্রবল ছিল যে চিকিৎসার জন্য পয়সা গ্রহণ করা মহাপাপ বলিয়া বোধ করিতেন।

গ্রামের বউ ঝি, ব্রহ্ম পিসীকে বড় ভয় করিত—বড় ভক্তি করিত। কোন বউ ঝির একটু বেচাল দেখিলে, ব্রহ্মপিসী যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতেন এবং সেই তিরস্কার একবার যে শুনিত, সে কিছু কালের জন্য সাবধান হইয়া চলিত। গ্রামের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কার কিরূপ স্বভাব ব্রহ্মপিসী সুন্দররূপ বুঝিয়াছিলেন। কে কিরূপ সতী, কিরূপ কলহশীলা, লজ্জাশীলা, সে বিষয়ের সুপারিস ব্রহ্মপিসীর ঠোঁটে লেখা থাকিত—সময়ে সময়ে ব্রহ্মপিসী শাশুড়ি শ্বশুরদিগকে শুনাইতেন। যে বধূ ব্রহ্মপিসীর সুখ্যাতি লাভ করিত—তার সৌভাগ্য যেন উথলিয়া উঠিত। কিন্তু ব্রহ্মপিসী কখন কাহারও সম্মুখে প্রশংসা করিতেন না, তিরস্কার করিতেন বটে। ব্রহ্মপিসীর তিরস্কার যাহার উপর পড়িত সে যেরূপ দুষ্টা স্ত্রীলোক হউক না কেন ভয়ে কাঁপিত—দুঃখে কাঁদিত, কিন্তু এই তীব্র তিরস্কার ঔষধের ন্যায় কার্য্য করিত।

কাহারও বাটীতে স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে ঝগড়া বিবাদ হইলে ব্রহ্মপিসী তাহা ভঞ্জন করিতেন। অনেক বিজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মপিসীর সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিতেন।

ব্রহ্মপিসীর বড় ছুঁচিবাই ছিল, সেই গ্রামের অনেকে এই কথা বলিয়া থাকেন। হাতে একটু কিছু ময়লা বা কাদা লাগিলেই পুকুরে গিয়া ভাল করিয়া ধৌত করিতেন, ঘরের জলে ধুইলে অপবিত্র থাকিবে মনে করিতেন। একটু কাদা কি গোবর মাড়াইয়াছেন অমনি বিষ্ঠা সন্দেহ করিয়া স্নান করিতেন ও সর্ব্বাঙ্গে গঙ্গাজল লইতেন।

ব্রহ্মপিসীর আর একটী বিশেষ গুণ ছিল তিনি বেশ ছড়া রচিতে পারিতেন। তাঁর রচিত অনেক ছড়া এখনও নাকি বাল্যকালে অনেকে উচ্চারণ করিয়া সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন।

উড়্কি ধানের মুড়কি দেব পথে জল খেতে
শরু ধানের চিড়ে দেব শাশুড়ি ভুলাতে—

এই প্রকারের অনেক ছড়া তিনি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। গ্রামের কোন বউ ঝি বিশেষরূপ পাপকর্ম্ম করিলে তার নামে ব্রহ্মপিসীর ছড়া বাহির হইত—জেলার কোন জমিদারের কারাগার হইলে, তার নামে ব্রহ্মপিসীর ছড়া বাহির হইত। সেই ছড়া মুখে মুখে কাণে কাণে দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িত। বালক যুবা চাষা, মাঠে ঘাটে সেই সব ছড়া সুর করিয়া গাহিত। তাঁর একটী ছড়া আমার মনে আছে :—

(কোন দুশ্চরিত্রাকে উপলক্ষ্য করিয়া)
ক্ষুদি রাক্ষসির ঝি কল্লি তুই কি ?
কুলে দিলি কালি দেশান্তরে গেলি ;
চৌদ্দপুরুষ একবারে নরকে ডুবালি।

ব্রহ্মপিসী যতদিন জিবিতা ছিলেন, গ্রামটা যেন জীবন্ত ছিল। একদা রাত্রে ব্রহ্মপিসী নিদ্রা যাইতেছেন। রাত্রি ভোর হইল। বাহিরে কাক ককিল ডাকিল। দেশ হইতে দেশান্তরে পাখী সকল ছুটিতে লাগিল। আকাশে সূর্য্যোদয় হইল। ব্রহ্মপিসী ভোরে উঠিতেন, সে দিন অনেক বেলায়ও উঠিলেন না দেখিয়া অনেক লোকে—ব্রহ্মপিসীর দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। ব্রহ্মপিসী ব্রহ্মপিসী বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ব্যাকুল প্রাণে অনেকে ডাকিতে লাগিল কিন্তু ব্রহ্মপিসীর তথাপি নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। পরিশেষে দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। দেখিল ব্রহ্মপিসী গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্না—সমুদয় শরীরে কালিমা পড়িয়াছে—চক্ষুদুটী ঢুলঢুল করিতেছে। ব্রহ্মপিসীর মাথার চুল ধরিয়া টানিবা মাত্র চুল খসিয়া আসিতে লাগিল। তখন সকলেই বুঝিল ব্রহ্মপিসীর সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে।

গ্রামশুদ্ধলোকে ব্রহ্মপিসীর শোকে অধির হইয়া কাঁদিল। ব্রহ্মপিসী মরিবার পূর্ব্বে ঔষধাদি কাহাকেও দিয়া যাইতে পারেন নাই—সুতরাং ব্রহ্মপিসীর মৃত্যুহওয়ায় দেশের সমূহ অমঙ্গল হইল—লোকের শোক বাড়িয়া উঠিল।

পূর্ব্বকালে গ্রাম বিশেষে ব্রহ্মপিসীর মত অনেক দেবী ছিলেন—আজকাল পূর্ব্ব গৌরবের সহিত সমুদয় লুপ্ত হইতেছে। ব্রহ্মপিসী একজন পূর্ব্বকালের আদর্শ বিধবা রমণী।

দেবভক্তি।

তারকেশ্বরের চারি ক্রোশ পূর্ব্বদিকে বন্দীপুর নামে একটী গণ্ডগ্রাম আছে। গ্রামের দক্ষিণ দিকে একটী নদী আছে। সে নদীতে এখন বর্ষায়, দামোদরের বন্যার জল আসিয়া থাকে—গ্রীষ্মে ও শীতে দামোদরের সুবিমল স্বচ্ছ নীর-ধারা ক্ষুদ্রায়তনে প্রবাহিত হয়। কিন্তু যে সময়ের কথা লেখা হইতেছে সে সময়ে উহার দামোদরের সহিত সংযোগ বন্ধ হইয়াছিল—নদীর মোহানার উপরে অনেক বাগান বাড়ি দেখা যাইত। সে সময়ে নদীটীকে 'কানা' নদী বলিত। এই নদীর ধারে বন্দীপুর গ্রামে দামোদর ভট্টাচার্য্য নামে সেই সময়ে একজন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করিতেন। তাঁহার নদী তীরে একখানি প্রকাণ্ড আম্র উদ্যান, উদ্যান সংলগ্ন একটী বড় পুষ্করিণী এবং বন্দীপুরের উত্তর মাঠে ব্রাহ্মণের ১২।১৩ বিঘা দেবস্ব জমী ছিল। বন্দীপুরে ব্রাহ্মণের অনেক যজমান। দামোদর ভট্টাচার্য্যের বহির্বাটীতে একখানি প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপ, সেই চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিবৎসর আশ্বিন মাসে 'মা দশভুজা' আসিতেন। দামোদর, মার পূজা বড় সাত্বিকভাবে সম্পন্ন করিতেন বলিয়া, নিকটবর্ত্তী ১০।১২ খানা গ্রামে দামোদরের দুর্গা পূজার প্রশংসা হইত। অনেকেই বলিত, দামোদর ভট্টাচার্য্যের দুর্গা পূজায় 'মা বাস্তবিকই আসিয়া থাকেন।'

দামোদর খুব পণ্ডিত ছিলেন—খুব ভক্তিপরায়ণ ছিলেন, কলি যুগে সেরূপ আদর্শ হিন্দু-জীবন সে বেলায় আর দেখা যাইত না।

একদিন দামোদর বিজয়ার দিন কাঁদিতে কাঁদিতে, প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়া, মার শোকে অচেতন হইয়া মার প্রতিমার ঠাটের সম্মুখে পড়িয়া আছেন—চক্ষু দিয়া ভক্তির অশ্রুজলে মাটী ভিজিয়া যাইতেছে—তাঁর চারিদিকে অনেকগুলি বৃদ্ধ, যুবা, বালক, বসিয়া দুর্গা নাম লিখিতেছেন এমন সময়ে দামোদর দেখিলেন, শঙ্খ-ঘণ্টা-গদা-চক্র হস্তে এক ষোড়শী রমণী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন 'বৎস তুমি শোকে কাতর হইও না—আমি এক বৎসর পরে আসিয়া তোমার একটী পুত্র সন্তানকে দেখিব—তার দেব

ভক্তিতে তোমার বংশ পবিত্র হইবে—কিন্তু সে গৃহে থাকিবে না।' দামোদর এই সকল ঘটনা দর্শনে, মা কই, মা কই, বলিয়া চীৎকারের সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে ধড় মড় করিয়া উঠিয়া, সকলের দিকে অশ্রুপূর্ণ নয়নে পাগলের মত চাহিতে চাহিতে বলিলেন 'তোমরা কি আমার মাকে দেখেছ? মা এই যে আমার সঙ্গে কথা ক'য়ে কোথায় চ'লে গে'লন।' একে বিজয়ার শোকে সকলেই ক্ষুব্ধ চিত্ত ছিল তাহাতে ভক্ত দামোদর ভট্টাচার্য্যের এই সকল ভক্তির কথা শুনিয়া সকলে 'মাগো' মাগো বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সেইখানে মাকে লক্ষ্য করিয়া প্রণাম করিতে লাগিল। দামোদর আবার ক'াদিতে ক'াদিতে বলিল 'ওরে আমার আর কিছু ভাল লাগে না—মা যে আমায় দেখা দিয়ে কোথায় লুকালেন। তাহার পর দামোদর 'মা ভগবতী। মা ভগবতী! জগজ্জননী! তুই কোথায়? বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। দামোদরের গলদ্ঘর্ম্ম হইতেছে দেখিয়া ২।৪ জন পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। সেদিন অন্যান্য সকলে কোলাকুলি প্রনামাদি করিয়া নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন। দামোদর সেইখানে থাকিলেন। দামোদরের স্ত্রী ও ভগিনী দামোদরের কাছে বসিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিল। রজনীতে দামোদারের ভক্তির নানাবিধ উচ্ছ্বাস, প্রলাপ, দামোদরের স্ত্রী ও ভগিনীকে ক'াদাইল। তাহারা সেদিন চণ্ডীমণ্ডপ—বাটী—এবং আপনাদের জীবন, যার অভাবে শূন্য শূন্য অনুভব করিতে লাগিল। আবার কবে আশ্বিন মাস আসিবে ভাবিয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে রজনী অতিবাহিত করিল। বিজয়ার দিন হইতে দামোদর নাকি আট দশ দিন বাটীর ভিতরে আর যাইত না—সেই চণ্ডীমণ্ডপেই থাকিত;—কখন স্মৃতি নেত্রে সেই দশভুজা মূর্ত্তি—সেই লক্ষ্মী সরস্বতী কার্ত্তিক গণেশ পরিবেষ্টিতা জননীর মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে আকুল প্রাণে ক'াদিত—কখন মাথার চুল ছিঁড়িত—কখন মা মা বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে বক্ষে করাঘাত করিত। বিজয়ার দিন প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া বাঙ্গালী মাত্রই ক'াদিয়া থাকে—কিন্তু দু একদিন পরে সে কান্নার ভাব আর থাকে না—কিন্তু সেই কান্নার বেগ সমস্ত বৎসর দামোদর-হৃদয়কে যন্ত্রণা দিয়া থাকে—আবার যখন শ্রীনাথ পোটো প্রতিমায় খড় জড়াইতে থাকে—তখন যন্ত্রণার বেগ কমিয়া যায়—আবার আনন্দের রেখা, আশার রশ্মি দামোদরের মুখে খেলিতে থাকে।

পর বৎসর পূজার একমাস পূর্ব্বে ভাদ্র মাসে দামোদরের একটী পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। এ পর্য্যন্ত দামোদর নিঃসন্তান ছিল—এখন অধিক বয়সে পুত্র পাইয়া খুব আনন্দিত হইল। পুত্রের নাম রাখিল—দুর্গাদাস।

দামোদরের বাটীতে শালগ্রাম শিলা ছিল। দামোদর অতি ভক্তির সহিত তাঁর পূজা করিতেন। দুর্গাদাস যখন বেশ চলিতে পারে;—দৌড়িতে পারে—তখন শাল-গ্রামের পূজার সময় দুর্গাদাস বাপের পিছনে পিছনে ঠাকুর ঘরে যাইত। একটী ধারে বসিয়া পূজার মন্ত্র শব্দ শুনিত—আনন্দে হাসিত—ঘণ্টা বাজিবার সময় দাঁড়াইয়া আমোদে নৃত্য করিত।

দুর্গাদাসের বয়স যখন ৪ বৎসর হইল; মুখে বেস কথা ফুটিল; তখন সাল-গ্রামের পূজার সময় বাপের কাছে বসিয়া এক দৃষ্টে সেই বিগ্রহের দিকে তাকা-ইত; বাপের সঙ্গে ঠাকুরকে প্রণাম করিত।

দুর্গাদাসের দৌরাত্ম ঠাকুরের নাম করিলেই নিবারিত হইত। অত অল্প বয়সে দুর্গাদাসের দেবভক্তি দেখিয়া দামোদর এবং অন্যান্য অনেকে আশ্চর্য্য হইয়াছিল। দুর্গাদাসের মা কখন কখন বলিত, এ ছেলে কি বাঁচবে।

এ দিকে ভাদ্র মাসে যখন দুর্গা প্রতিমার কাটে ঘা পড়িত বাটীতে মহা রোলে শাঁখ ঘণ্টা কাঁশর বাজিত; তখন দুর্গাদাসের প্রফুল্লবদন দেখিলে অনে-কের প্রাণ ভক্তিতে বিগলিত হইত। দুর্গাদাসের বয়স যখন ৫ বৎসর তখন হইতে সে ভক্তিতে এক এক দিন কাঁদিয়া ফেলিত। দুর্গোৎসবের সময় যখন ধুপ ধুনা জ্বালিয়া চামর পাখার বাতাস দিতে দিতে দুর্গা প্রতিমার অরতি হইত; শাঁখ ঘণ্টা ও কাঁশরের সহিত কাড়ানাগরার বাজনা বাজিত এবং দামোদর ভট্টাচার্য্য উন্মত্তের মত মা মা বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে, দেবমূর্ত্তির সম্মুখে সাষ্ঠাঙ্গে প্রণিপাত করিত, তখন বালক দুর্গাদাস চণ্ডীমণ্ডপের একটী পাশে অবাক ভাবে বসিয়া নীরবে চক্ষের জল ফেলিত—কখন বাপের দিকে তাকাইয়া থাকিত, কখন বা স্বর্ণময়ী প্রতিমার দিকে সজল নেত্রে নিরীক্ষণ করিত। দুর্গাদাসের সেই অবস্থায় দুর্গাদাসের পিসী ও অন্যান্য বৃদ্ধাগণ দুর্গাদাসকে কোলে লইয়া, বাবা। তুই ধ্রুব না প্রহ্লাদ! তোর ভিতরে মার এত খেলা! মাগো। চৈতন্যরূপিনী! বাছাকে বাঁচিয়ে রাখ—বলিয়া দুর্গাদাসের মুখ চুম্বন করিত। দুর্গাদাস তখন প্রবলতর বেগে কাঁদিয়া ফেলিত। ঠাকুর

বিসর্জ্জনের দিন পিতার ক্রন্দনের সহিত ক্রন্দন করিত। বাপকে জিজ্ঞাসা করিত, বাবা! তুই কাঁদিস কেন? বাবা বলিত 'বাবা। মা আমাদের বাটীতে তিন দিন ছিলেন, আজ আর থাকবেন না—কৈলাসে যাবেন। তাই প্রাণ কেমন করছে।' পিতার চক্ষের জলের সহিত এই সকল কোমল কথা দুর্গাদাসের কোমল প্রাণে এমনি আঘাত করিত যে বালক কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিত, তা তুই কাঁদছিস কেন? আমি যেমন মার সঙ্গে পাল্কি ক'রে, মামার বাড়ি যাই, তেমনি তুই মার সঙ্গে যানা কেন? বাবা আমিও তোর সঙ্গে যাব।' বালকের মুখে এই সরল ভক্তিপূর্ণ কথা শুনিতে শুনিতে দামোদর মার ভাবে অস্তিত্বকে পরিপূর্ণ কবিয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিত।

ছয় বৎসর বয়সে দুর্গাদাস গ্রামের পাঠশালায় লিখিত। কিন্তু তার লেখা ভাল লাগিত না। পূর্ব্ব রাত্রে পিসীমার কাছে যে কালীর কথা শুনিয়াছিল; মুকুন্দ ঘোষের পাথর হইবার কথা শুনিয়াছিল; কবে বাপের নিকট প্রহ্লাদের গল্প ও ধ্রুবোপাখ্যান শুনিয়াছিল; সেই সব পাঠশালায় বসিয়া ভাবিত। তবে দুর্গাদাসের বুদ্ধির প্রখরতাবশতঃ শীঘ্র শীঘ্র শিখিতে লাগিল। ৮ বৎসরে শুভঙ্করী অঙ্ক কষিতে, শিশুবোধ পড়িতে শিখিল। দুর্গাদাস পাঠশালায় তাল-পাতে নাম লিখিবার সময় কেবল দেবতাদিগের নাম লিখিত। এক দিন গুরুমহাশয় দেখিল, দুর্গাদাস কাঁদিতে কাঁদিতে নাম লিখিতেছে। গুরুমহাশয় জিজ্ঞাসিল, দুর্গাদাস কাঁদছ কেন? কেউ মেরেছে? দুর্গাদাস কোন উত্তর করিল না। এক জন কাছের ছেলে বলিল, গুরুমহাশয়! ও রোজ অমনি নাম লেখবার সময় কাঁদে। আমি ওকে মশাই! এক দিনও মারিনি। গুরুমহাশয় উঠিয়া গিয়া দেখিল, দুর্গাদাস ক্রমাগত "দুর্গা" "দুর্গা" লিখিতেছে—পাতার মাঝে মাঝে চক্ষের জল ফেলিয়াছে। দুর্গাদাসের খুব ভাল হউক, বলিয়া দেব ভক্তিতে কাঁদ্ কাঁদ্ হইয়া গুরু মহাশয় নিজস্থানে গেল।

এক দিন দুর্গাদাস পাঠশালে আসিতে আসিতে ঘাসবনে একটী সুগোলা-কার প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পাইল। সে, যতনে সেটীকে কুড়াইয়া দোবজ্‌নের ভিতর রাখিল। পাঠশাল হইতে ঘরে আসিয়া, ঠাকুরঘরের দাওয়ার এক পাশে এক খানি ইট্ ধুইয়া তার উপরে সেটীকে রাখিল। রাখিয়া, ফুল চন্দন দিয়া পূজা করিল। দুর্গাদাস সেই ঠাকুরটী পাঠশালে যাইবার সময়

দোবজ্জনে করিয়া, লইয়া যাইত। এক দিন পাঠশালার এক জন দুষ্ট ছেলে সেই ঠাকুর চুরী করিয়া নিকটবর্ত্তী একটী পুকুরের পাড়ে ফেলিয়া দিল। দুর্গাদাস পাঠশালার ছুটী হইলে দোবজ্জনের ভিতরে কলম, পেন্সিল, কাগজ, পুস্তক দেখিল—ঠাকুর দেখিতে পাইল না। গুরুমহাশয়ের নিকট নালিস করিল। গুরুমহাশয় কাল বিচার হবে, বলিয়া চলিয়া গেল। তখন সন্ধ্যা। দুর্গাদাস কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে গেল। গিয়া দড়াম করিয়া উঠানে পড়িয়া, ওগো আমার ঠাকুর চুরী করেছে কে, বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিল। দুর্গাদাসের মা পিসী, বাপ উঠানে আসিয়া নানা প্রকারে প্রবোধ দিতে লাগিল। দুর্গাদাসের কিছুই ভাল লাগে না। দুর্গাদাসের বাপ, সন্তানের দেবভক্তির তোড় দেখিয়া উচ্ছ্বাসিত হৃদয়ে সজল নয়নে, দুর্গাদাসকে কাল ঠাকুর দেবে, বলিয়া প্রবোধ দিতে লাগিল। পিতা, মাতা, পিসীর অনেক চেষ্টায় দুর্গাদাস উঠান হইতে উঠিল। কিন্তু কোন ক্রমেই কিছু খাবে না। নিজেও খাইল না, কাহাকেও খাইতে দিল না; ঠাকুরের জন্য ভয়ানক হাঙ্গামা করিল। পিতা দামোদর, অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, আচ্ছা দুর্গাদাস! আমাদের ঘরে তো ঠাকুর আছেন, তবে অত কাঁদছ কেন? দুর্গাদাস বলিল, 'সে ঠাকুর তো তোর; সে ঠাকুর আমায় তবে দে, আমি আমার বিছানার কাছে নিয়ে শোবো, আমি আমার ঠাকুরকে তো বিছানায় আমার বালিশের কাছে রেখে শুয়ে থাকি।" পিতা বলিল 'আচ্ছা আজ আমরা ঠাকুর ঘরে শোব এখন। দুর্গাদাস এ কথায় অনেকটা শান্ত হইল। শান্ত হইয়া আবার কাঁদিতে লাগিল "আমি আমার ঠাকুর না পেলে কখন খাব না,' বলিয়া কান্নার বেগ বাড়াইল—পিতা, মাতা, পিসী সকলকে দেব ভক্তির উচ্ছ্বাসে ভাসাইল।

দুর্গাদাস কাঁদিতে কাঁদিতে মার কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইতে ঘুমাইতে শোকের বেগে শরীর কাঁপাইয়া মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিল। দুই তিন ঘটা পরে দুর্গাদাস, মা! মা! বাবা! বাবা! ঐ যে আমার ঠাকুর! ঐ যে আমার ঠাকুর! বলিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। দুর্গাদাসের মা ও পিসী বলিল 'কৈ ঠাকুর বাবা! কৈ তোমার ঠাকুর।' দুর্গাদাস কথার উত্তর না দিয়া দাঁড়াইল—একদিকে

ছুটিল। ওমা ছেলে কোথা যায়গো ! ও ঠাকুরঝি তাঁকে ডাকনা ! ছেলেকে কিছুতে পেলে না কি ! বলিতে বলিতে মা দ্রুতবেগে গিয়া সন্তানকে ধরিল। ধরিলে, "মা তোরা আমার সঙ্গে আয়—আমাদের পাঠশালের সামনে তাল-পুকুরের সেই হ্যালা তালগাছের তলায় আমার ঠাকুর পড়ে আছে, আমি দেখতে পেয়েছি" ;—হৃদয়ের আবেগের সহিত দুর্গাদাস এই কথা বলিল। এদিকে দামোদর ভগিনীর ডাকে উঠিয়া আসিয়া বলিল, কি হয়েছে ? দুর্গাদাস বাবার হাত ধরিয়া বলিল, বাবা ! তুমি আমার সঙ্গে চল, ঠাকুর পেয়েছি ; সেই পাঠশালের সামনে পুকুরের হ্যালা তালগাছের তলায় আছে।

তখন জ্যোৎস্নাছিল। পুত্রের সঙ্গে সঙ্গে পিতা চলিল। সেই পুকুরের ঘাটে নামিয়া, দুর্গাদাস উন্মাদের ন্যায়, "ঐ তালগাছের নীচে," বলিয়া এক চীৎকার করিল। দুর্গাদাস দ্রুতবেগে সেই গাছের দিকে দৌড়িয়া গিয়া তাল তলায় পতিত সেই প্রস্তর খণ্ড—সেই বিগ্রহ—সেই দেবতাকে গ্রহণ করিল। এই ঘটনা দেখিয়া দামোদর, ভক্তি বিশ্বাসের এক অভিনব রাজ্যে প্রবেশ করিয়া এই সংসারের অনিত্যতা এবং ভক্তির মাহাত্ম্যের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে ভক্ত পুত্রের সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রী ও ভগিনীকে অনেক কথার সঙ্গে এই কথাটী ভক্তির আবেগের সহিত বলিলেন "ভক্তি যে পাত্রে পড়ে সেখানে ঈশ্বর অবির্ভূত হইয়া যে লীলা করেন, তা বোধ হয় দেখলে। কাল হইতে ঐ শিলার নিয়মিতরূপ নৈবেদ্যাদির দ্বারা পূজা করিতে হইবে। ভক্তি যে, প্রস্তর-মৃত্তিকায় ঈশ্বরকে জাগ্রত করেন, তা ভগবান আমার দুর্গাদাসের ভক্তির ভিতর দিয়া, দেখাইলেন।" উপদেশ শুনিতে শুনিতে সকলে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। দামোদর পরদিন দুর্গাদাসের 'শালগ্রামকে' রীতিমত অনুষ্ঠানের সহিত দেব-গৃহের এক অংশে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

পিতা—পুত্রের ভক্তিতে দেশটী জাগ্রত হইতে লাগিল। দুর্গাদাসের বয়স যখন ১৮ বৎসর হইল তখন দুর্গাদাস মহাভক্ত হইয়া পড়িলেন। হরিনাম শুনিলেই কাঁদিতেন ঠাকুর দেখিলেই ভাবে অভিভূত হইতেন। সেই সময়ে দামোদর পরোলক প্রাপ্ত হইলেন। দুর্গাদাসের জননী কয়েক মাস পরে স্বামীর অনুসরণ করিলেন। দুর্গাদাস পিসীমার নিকট একটী আত্মীয় ভ্রাতাকে

রাখিয়া, বিষয়াদি সেই ভ্রাতার নামে লিখিয়া দিয়া, ভক্তি বৈরাগ্যের তাড়নায় সংসার হইতে অবিবাহিত অবস্থায় জনমের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সঙ্গীতানুরক্তি।

(একটা গল্পমাত্র।)

কখন গান গাহে নাই বা গানে মুগ্ধ হয় নাই—এমন লোক নাই। যদি থাকে, সে নরহত্যা না করিয়া থাকিতে পারে না—সে ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব নহে।

সঙ্গীতের মত মোহিনীশক্তি আর কিছুরই নাই। গানের শব্দে সাপ ফণা তুলিয়া কি শুনে—শিশু কাঁদিতে কাঁদিতে থামে—বনের বাঘ বিমোহিত হয়—গম্ভীর শোক শুখাইয়া যায়। তোমার গান অপরের ভাল না লাগিতে পারে, কিন্তু তুমি আপনার গানে আপনি মোহিত হও। যখন মনে ভাবের তরঙ্গ উঠে, তখন নীরবে প্রাণ খুলিয়া গান গাহিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? মানুষ এরূপ অবস্থায় গান না গাহিয়া থাকিতে পারে না। তার গানে হয়তো পার্শ্ববর্ত্তী লোক সকল জ্বালাতন হইতে পারে। কিন্তু সে গান গাহিয়া প্রাণ খালি করিয়া, একটী তৃপ্তির ঘোরে আচ্ছন্ন হইতে হইতে, জীবনের দুঃখ ভুলিয়া সুখের স্বর্গ সম্ভোগ করিতে থাকে। পাঠক! এ বিষয়ের একটী গল্প বলি শুন:—

কোন সহরে পাঁচকড়ি নামে একজন ব্রাহ্মণ যুবক ছিল। সে লোকটা বড় সঙ্গীতপ্রিয়। যাত্রা পাঁচালী কবি শুনিতে এত ভাল বাসিত যে, নিজ বাসস্থান হইতে পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে, কোন দলেব গাহনা হইতেছে, জানিতে পারিলে, বাড়িতে নানা বিপদ সত্বেও, তাহা শুনিবার জন্য গমন করিত। গাহনা শুনা ছাড়া পাঁচকড়ির গান গাহিবার প্রবৃত্তিও অত্যন্ত অধিক ছিল। ঘরে বাহিরে মাঠে ঘাটে শয়নে স্বপনে গান না গাহিয়া থাকিতে পারিত না। বিবাহ করিবার পর গান গাহিবার বাতিক বড় বাড়িয়া গেল।

ভগবান নিখুঁত জিনিস কিছুই স্থজন করেন নাই। সুতরাং পাঁচকড়ির গান গাহিবার শক্তিতে যে একটী প্রবল দোষ বসাইয়া দিয়াছিলেন, তজ্জন্ত তিনি নিশ্চয়ই দোষী। তাহাতে পাঁচকড়ি ব্যাচারার কোন দোষ নাই।

পাঁচকড়ি অনেক গান শিখিয়াছিল। সর্ব্বদা গান গাহিত। কিন্তু গলার স্বরটী এমনি বিকৃত—ভীষণ—কর্কশ, যে সে স্বর উঠিবামাত্র মানুষের কাণে যেন বিষবর্ষণ হইত—মানুষ শুনিতে শুনিতে জালাতন হইয়া—হয় পাঁচকড়িকে চুপ করিতে বলিত—না হয় সে স্থান হইতে সরিয়া যাইত। পাঁচকড়ির সে সময়ে পুত্র শোক উপস্থিত হইত। ব্যাচারা এত পরিশ্রম করিয়া গায়—আর লোকে জ্বালাতন হয়; ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে! পাঁচকড়ির একেতো সুরবোধ ছিল না; তাহাতে আবার স্বর-কর্কশতা থাকায়, গানের শব্দ হইবামাত্র পৃথিবীতে একটা ভীষণ ব্যাপার উপস্থিত হইত। পাঁচকড়ির গানে যে কেবল মানুষে জ্বালাতন হইত তাহা নহে; বাগানে বসিয়া গান গাহিলে, গাছের কাক গুলাও নাকি বাস্তবিক কাকা শব্দে উড়িয়া, ত্রাহি ত্রাহি করিতে করিতে, সেস্থান হইতে পলায়ন করিত—পাঁচকড়ির গানের আওয়াজে বন্দুকের আওয়াজের মত কাজ হইত।

পাঁচকড়ি সে দিকে ভ্রুক্ষেপ করিত না। সে ঈশ্বর দত্ত প্রবৃত্তির সদ্ব্যবহারে একটু ও ত্রুটি করিত না।

বিবাহের পর পাচকড়ি সমস্ত রাত্রি গান গাহে। কাছে স্ত্রী ছিল না, কিন্তু স্ত্রীর উদ্দেশে কত বিরহ কত প্রেম কত মিলন বিষয়ক গান গাহিয়া থাকে। প্রতিবাসীগণ রাত্রে ঘুমাইতে পারে না। সেই বিকট শব্দের বিকট তরঙ্গ তাহাদের কাণের পর্দ্দায় পর্দ্দায় যেন শুঁচ ফুটাইতে থাকে। বাঘের স্বর বরং ভাল; কাকের গান বরং ভাল। কারণ তাহাতে স্বাভাবিকতা আছে আর পাচকড়ির গানে ভুতের গানের অপেক্ষাও কর্কশতা থাকায়, তাহা শুনিয়া মানুষের প্রাণ চীৎকার করিয়া উঠিত। কাছের ২।৩ টা কুকুরও সে গানে জ্বালাতন হইয়া খেউ খেউ করিয়া সমস্ত রাত্রি ডাকিতে থাকিত। কুকুরের ডাক অনেকের সহ্য হইত; পাঁচ কড়ির গান যেন বিষবর্ষণ করিত। মানুষও জ্বালাতন হয়—পাঁচকড়ির গানের স্রোত ও বাড়ে; সুতরাং পাড়ার সকলে একদিন একত্র হইয়া পরামর্শ করিল। পরামর্শের পর ৪।৫ জন করযোড়ে

পাঁচকড়ির নিকট বিনীতভাবে বলিল "আমাদের রাত্রে ঘুম হয় না—তুমি যদি গান না গাও তো বাঁচি।" শুনিবা মাত্র পাঁচকড়ি রাগে জলিয়া উঠিল। ক্রোধিতস্বরে বলিল, আমি আমার বাবার ঘরে বসিয়া গান গাই—তোমাদের তাতে কি? আমি গান কখনই থামাইব না—আমার গান তোমাদের ভাল লাগে না, কেন? আমি কি মানুষ নই?

যাহারা বলিতে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ২।৩ জন হাসিয়া উঠিল। পাঁচকড়ি সে হাসি দেখিয়া আরও রাগিল। ঘরে গিয়া আবার গান আরম্ভ করিল। লোকগুলা কানে হাত দিয়া দ্রুত বেগে পলায়ন করিল।

পাঁচকড়ির গান কিছুতেই থামেনা দেখিয়া, প্রতিবাসীগণ পাঁচকড়ির উপর নানাবিধ অত্যাচার করিতে লাগিল। একদিন অপরাহ্নে ৪।৫ জন যুবা রাগিয়া পাঁচকড়ির বাড়িতে প্রবেশ করিল, প্রবেশ করিয়া পাঁচকড়িকে খুব প্রহার দিল। প্রহার খাইবার পরে পাঁচ কড়ি মনের দুঃখে কাঁদিতে লাগিল। মনে মনে ভাবিল, আর গান গাহিব না—যদি গাইতো গুণগুণ স্বরে—জোরে আর নয়। কিন্তু পাঁচকড়ি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিল না। তাহার অনেক বৎসরের পোষা গান তাহার শাশন কিছুতেই মানিতে চাহে না। পাঁচ-কড়ি যত চুপে চুপে গাহিতে যায় গান সজোরে কণ্ঠ জিহ্বা ওষ্ঠ ভেদিয়া বাহির হইতে থাকে এবং চারি দিকে পূর্ব্বের মত ভীষণতার স্রোত প্রবাহিত করে। পরিশেষে পাঁচকড়ি গানের অনুরোধে গৃহ ছাড়িয়া, সহরের বাহিরে একটা বড় রাস্তার ধারে একটী অশ্বত্থ তলায় বসিয়া গান গাহিতে লাগিল। পাঁচকড়ি সকালে উঠিয়া সেই খানে গিয়া বসিত এবং মনের সাধে মেঠো হাওয়ায় আপনার স্বর ছাড়িয়া দিয়া কত কি গান গাহিত। প্রথম দিনের আওয়াজ শুনিতে শুনিতে অনেক পাখী সে অশ্বত্থ গাছ পরিত্যাগ করিল—কা কা কা কা শব্দে কাক সকল—পাঁচকড়ির গানের সুরে মাধুরি বৃদ্ধি করিয়া আকাশকে প্রলয় সঙ্গীতে যেন ভাসাইয়া উড়িয়া যাইতে থাকিল। একটা হনুমান গাছে বসিয়াছিল—সে ব্যাচারা পাখীগুলার পলায়নের পূর্ব্বেই উপ উপ্ শব্দে লম্ফ ঝম্প করিয়া উর্দ্ধলাঙ্গুলে গাছ হইতে পড়িয়া—মাঠের উপর দিয়া দ্রুতবেগে পলাইয়া গেল। কাছে একটী তেতুল গাছে সহস্র সহস্র বাদুড় ঝুলিতেছিল, তাহারা সেই ভীষণ কর্কশতায়, সংসারে বুঝি প্রলয় হইল ভাবিয়া, কিচ্ মিচ্

করিতে করিতে দ্রুত অঙ্গসঞ্চালনে যেন তেঁতুলগাছটীকে লইয়া আকাশে উড়িবার উদ্যোগ করিল। বাদুড়গণ একে একে দিশে হারার মত ক্ষিপ্তভাবে নানাদিকে চলিয়া গেল। পাঁচকড়ি সেই সব কাণ্ডের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াও গাহিতে নিরস্ত হইল না—ভগবানদত্ত 'অস্ত্রে ভগবানের রাজ্য ধ্বংসে নিযুক্ত থাকিল।

পাঁচকড়ির গান ২।৩ দিন পরে, মাঠের কৃষক দিগের কর্ণকুহরে ভয়ানক আঘাত করিতে লাগিল। যদি ভগবান পাচকড়িকে পৃথিবীতে পাঠাইবার আগে, মনুষ্যের কানের চামড়াকে গণ্ডারের চামড়ায় তৈয়ার করিতেন তে পাঁচকড়ির গান গাহার দরুণ নির্ব্বোধ লোকে কথনই চটিত না, কিন্তু ঈশ্বর তাহা না করায় লোকেদেরও ক্লেশ, পাঁচকড়ির ও যাতনা।

পাঁচকড়ির গানের জ্বালায় আধ ক্রোশের মধ্যে আর কোন কৃষক ক্ষে কাজ করিতে চাহিল না। ৫।৬ দিন পরে পাঁচকড়ি দেখিল ক্ষেতে অ কৃষক নাই—গাছে আর পাখী নাই—আকাশের পাখী তাহার কাছদি উড়িয়া যায় না। পাঁচকড়ি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া গান গাহার ক্রমশ উন্নতি করিতে লাগিল। সাপ—ব্যাঙ, গর্ত্ত ছাড়িয়া দেশান্তরে গেল—শৃগা খ্যাঁকশিয়ালীরাও বিবর ছাড়িল।

পাঁচকড়ি ভাবিল, একলা গান গাহিলে সুখ হয় না। এক জন শ্রোত না থাকিলে গান গাহিয়া সুখ হয় না। মনে মনে ভাবিল, বিধা আমার কর্ক্কশ কণ্ঠ দিযাই সর্ব্বনাশ করিয়াছেন বোধ হয়। আবার ভাবি কই আমি তো আমার গানে মোহিত হই। আমার গান আমায় যেমন ভা লাগে, অনেক ওস্তাদের গান তো তত ভাল লাগে না। বোধ হয় আম গানে মিষ্টতা অধিক, তাই লোকে অত্যন্ত জ্বালাতন হয়—যাহা হউক এক জ শ্রোতা চাই, নহিলে গান গাওয়া বৃথা। এইরূপ ভাবিতেছে এমন সময় দৈ দুর্ব্বিপাক বশতঃ সেই স্থান দিয়া একজন মজুর ঝুড়ি মাথায় দিয়া, এ কোদাল হাতে করিয়া, কাজ করিতে যাইতে ছিল। পাঁচকড়ি তাহার ডাকিল।

পাঁচ। তুই কোথা যাচ্ছিস ?

কৃ। মাটী কাটিতে

পাঁ। কত মজুরি পাস

কৃ। দিন চার আনা।

পাঁ। আমি রোজ নগদ চারআনা করিয়া দেব—আমার কাজ করিবি?

কৃ। কি কাজ?

পাঁ। কাজ আর কিছুই নয়—কেবল আমার কাছে বসিয়া বসিয়া—গান শুনিবি।

কৃষক, শুনিয়া আশ্চর্য্য হইল। ভাবিল, এতো খুব মজা দেখছি—লোকে সা দিয়ে গান শুনে, আমাকে পয়সা দিয়া গান শুনাইতে চায়, এতো সুভা-না হ'লে জোটে না। কৃষক, মহানন্দের সহিত রাজী হইল।

পাঁচকড়ি বলিল "তা—আজই ব'স—আমি গান গাই—তুই শোন—সা সন্ধ্যার সময় পাবি।"

কৃষক গান শুনিতে বসিল। পাঁচকড়ি তখন গভীরানন্দে গান আরম্ভ রিল।

গানের ২।৩ টা কথা ভীষণ শব্দে কৃষকের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া তাহার নেক বৎসরের সঞ্চিত কানের খোল রাশিকে আন্দোলিত করিল। কিয়ৎ-ণ পরে, দুকান দিয়া দুইটী প্রকাণ্ড খোলের চাঁই পড়িয়া গেল। কৃষকের কান খন উন্মুক্ত হওয়ায়, গান প্রবল ভাবে নির্ব্বিবাদে অবিরোধে কর্ণপটাহে আঘাত তে করিতে কৃষকের মগজে ব্যথা ধরাইয়াদিল। গান শুনিতে শুনিতে ঘণ্টার পরই কৃষকের ভয়ানক মাথা ধরিল—সর্ব্বশরীর ঘুরিতে লাগিল। ক অবশেষে কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, মহাশয়! আজ আমায় ছাড়িয়া া—কাল আবার আসিব।

পাঁ। ও ব্যাটা আসিবি না?

কৃ। মাথা ছাড়িলে তো?

পাঁ। মাথা ধরিল কেন?

কৃ। আপনার গান শুনিতে শুনিতে।

পাঁ। দুর বেল্লিক? এই চার আনা নে। আরও একটা টাকা নে। গামী দিলাম। কাল থেকে আবার আসিবি?

কৃষক, এক টাকা চারি আনা কাপড়ে বাঁধিয়া প্রস্থান করিল। কৃষককে

পাঁচকড়ি চিনিত। কৃষক চলিয়া যাইলে, গাহক ভাবিল, যদি টাকা আগামী লইয়া না—আসে তো, ধরিয়া আনিব।

পর দিন অনেক বেলা হইল; কৃষক আসিল না। তখন পাঁচ কড়ি কৃষকের জন্য বেলা ১২ টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া, আপনার ঘরে ফিরিল। আহার করিযাই কৃষকের অন্বেষণে চলিল।

কৃষক তখন দাওযায় বসিয়া, পাথরে করিয়া ভাত খাইতেছিল। ভাতে গ্রাস চিবাইতে চিবাইতে সম্মুখস্থ রাস্তায় পাঁচকড়িকে দেখিবা মাত্র স্তম্ভি হইল। কৃষক ভাবিল, না খাইয়া মরিব সেও ভাল, তবু পয়সা লইয়া ঝালাপালা করিতে পারিব না। পাঁচকড়ি সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলে, পাঁচকড়িকে বলিল, চুপ করিয়া ঐ পিঁড়েটার উপর বসুন—গান এ গাহিবেন না—আমার ছেলে ঘুমুচ্ছে স্ব.ন দেখে আঁতকে উঠ্‌বে।"

কথাটী শুনিয়া পাঁচকড়ির মনটা মুচড়াইয়া গেল। পাঁচকড়ি করিয়া বসিল। কৃষক ভাত খাইয়া উঠিবামাত্র পাঁচকড়িও উঠিল। কৃ ডোবায় গিয়া আঁচাইল—আঁচাইয়া উঠিয়া এক দিকে দ্রুতবেগে চলিল পাঁচকড়িও পশ্চাতে ধাববান হইল। খানিকটা দূরে গিয়া কৃষক ব 'মহাশয়! আমি গান শুনিতে পারিব না—আমার মাথার মগজ পচি যাবে।'

পাঁচকড়ি বলিল 'শালা! তবে আমার টাকা ফেরৎ দে বলছি।' কৃষ বলিল, আমি দেব না—আমার মাথার অসুখের চিকিৎসার খরচা কে দেবে পাঁচকড়ি অবশেষে বিমর্ষ প্রাণে ফিরিয়া সেই অশ্বত্থ তলে বসিয়া গান গাহিতে লাগিল।

পাঁচকড়ি গান গাহিতেছে এমন সময়ে জমিদারের গোমস্তা আসিযা বলিল 'মহাশয়! আপনার নামে যত প্রজা এই বলিয়া নালিশ করিযাছে যে আপনার গানের জ্বালায় কোন কৃষক ক্ষেতে কাজ করিতে পারে না। জমিদারে হুকুম, আপনি আজ হইতে আর এখানে বসিয়া গান না গাহেন।' পাঁচক বিমর্ষ মনে সেস্থান পরিত্যাগ করিল।

পরদিন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একটী জঙ্গলে গানের আড্ডা ঠি করিল। জঙ্গলে গিয়া গান ধরিল। গানের প্রথম উৎপাতে কাক পাখী শৃগা

নউল প্রভৃতিরা তো পলায়ন করিল। কিন্তু একদিন অমাবশ্যার রাত্রে জঙ্গলের ভূত সকল একত্র হইয়া ধর্ম্মঘট করিল।

ভূতেদের সভায় সকলে একমত হইয়া এই স্থির করিল যে, তাহাদের রাজা ব্রহ্মদৈত্য মহারাজকে পাঁচকড়ির নামে নালিশ করিতে হইবেক। যদি রাজা মহাশয় পাঁচকড়ির গানের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে না পারেন, তো, আমরা এ জঙ্গল ছাড়িয়া অন্য জঙ্গলে অন্য ব্রহ্মদৈত্যের অধীনে বাস করিব।

পরিশেষে বেল গাছের ঝোঁপের মধ্যে ব্রহ্মদৈত্যেব নিকট একটী প্রেতিনী দিগের দরখাস্ত লইয়া হাজির হইল। ব্রহ্মদৈত্য দরখাস্ত পড়িয়া বলিলেন, যাও—আমি কাল পাঁচকড়ির হাতে পায়ে ধরিয়া এখান হইতে বিদায় ব। পাঁচকড়ির গানের জ্বালায় আমরাও জ্বালাতন হইয়াছি।

পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে পাঁচকড়ি আনন্দের সহিত গান গাহিতেছে, সময়ে, পশ্চাতের বৃক্ষ সকলের অন্ধকারের ভিতর হইতে ব্রহ্মদৈত্য বাহির য়া, খড়ম পায়ে গলায় ফুলের মালার সহিত, করজোড়ে পাঁচকড়ির সম্মুখে য়া প্রণাম করিল। পাঁচকড়ি ভয়ে সিহরিয়া উঠিল। ব্রহ্মদৈত্য তখন তভাবে বলিল 'মহাশয়! আপনার পায়ে পড়ি, আর এস্থানে আসিয়া ন গাহিবেন না—এ জঙ্গলে অনেক ভূত বাস করে। আপনার গানের র্কশ স্বরে অনেক ভূত পলাইয়াছে—আরও যদি উৎপাত করেন তো অবশিষ্ট লেই পলাইবে—আমাকেও পলাইতে হইবেক।"

পাঁচকড়ি তার পরদিন হইতে, ভূতের ভয়ে আর সে জঙ্গলে যাওয়া বন্ধ রিল। মনের কষ্টে অবশেষে দেশত্যাগ করিল।

দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে যাইতে একটী গ্রামে গিয়া শুনিল, সে গ্রামের দারের স্ত্রীকে ভূতে পাইয়াছে—কেহই সে ভূত ছাড়াইতে পারিতেছে না। কড়ি ভাবিল, আমার গানে যখন জঙ্গলের কোটী কোটী ভূত পালাইয়াছে টী ভূত কি পলাবে না? তখন পাঁচকড়ি মহা আনন্দে জমিদারকে জানা-, আমি ভূতের বোঝা—আমি গানে ভূত ছাড়াইতে পারি। পাঁচকড়িকে দার মহাশয় আপনার স্ত্রীর সম্মুখে লইয়া যাইবা মাত্র, সেই ভূতটা চীৎকার রিয়া বলিল 'ওঁরে আঁবার পেঁচোঁ এঁসেঁছেঁ, ওঁর গাঁনেঁর জ্বাঁলাঁয় ঙ্গল ছেঁড়েঁ এই মাঁগিটাঁকে আঁশ্রয় কঁরেছিলাম—এখানেও পেঁচো এঁলেঁ।

উবে পালাই পালাই। বলিতে বলিতে ভূতটা বাটীর সম্মুখের আম গাছের একটা ডাল ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিল। জমিদারের স্ত্রী আরাম হইল। পাঁচ-কড়ি ২০০০৲ টাকা পুরস্কার পাইল।

উপদেশ—এক বিষয়ে লাগিয়া থাকিলে, সুফল এক সময়ে পাওয়া যায়।

রঙ্গরস।

(১)

সৃষ্টি দুই প্রকারের—ঈশ্বরের ও বিশ্বামিত্রের। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে ডাঙ্গায় জল এবং বিশ্বামিত্রের সৃষ্টিতে গাছে জল (নারিকেল।) পাঠক। যাঁহারা ঈশ্বরবাদী তাঁহারা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের সৃষ্টি—আর যাঁহারা নাস্তিক তাঁহারা বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি। যাঁহারা ঈশ্বরের সৃষ্টি তাঁরা ঈশ্বরকে না মানিয়া থাকিতে পারেন না; আর যাঁহারা তাহা নহেন, তাঁহারা কি প্রকারে মানিবেন? অতএব নাস্তিকদিগকে আস্তিকদিগের গালাগালি দেওয়াটা ভাল নহে।

(২)

পিতৃভক্তির বিরুদ্ধে কোন বৈজ্ঞানিক এইরূপ যুক্তি দিয়াছেন। পিতৃরক্ত—কণিকা মানুষের দেহে কয়েক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত থাকে, তারপর আদতে থাকে না, অতএব কয়েক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সন্তান পিতার নিকট ঋণী তারপর সে প্রকৃতপক্ষে ঋণী নহে। বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত দলের মধ্যে পিতৃভক্তির অভাব দেখিয়া যদি কেহ দুঃখ করেন তো, তিনি বিজ্ঞান শাস্ত্র সম্বন্ধে নিতান্তই মূর্খ।

(৩)

বিধবা ললনাকুমারী, ২৫ বৎসরের বি, এ, পাশ করা ছেলে কোলে করিয়া, জনষ্টুয়ার্ট মিলের স্বাধীনতার মন্ত্র আওড়াইয়া, বিলাত ফেরত মিঃ বানুর্জ্জিকে বিবাহ করিয়া, সতীত্বের পরাকাষ্ঠায় ভারতবর্ষ উজ্জ্বল করিয়াছেন। কারণ পতিভক্তি থাকিলেই পতির প্রয়োজন। বিনা পতিভক্তিতে কেহ সতী হইতে

পারে না। যাহার জন্য ভক্তি, তার সঙ্গে সঙ্গে যদি ভক্তিটাও যাইতো, তো, নবীনা বিধবা সে ভক্তির ভাবে অভিভূতা না হইয়া, বেস গাঝাড়া দিয়া হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতে পারিত। কিন্তু পতি বিহনে সেই পতিভক্তিটা আশ্রয় পাইবার জন্য বিধবাকে এমনি তাড়না করিতে লাগিল যে, সতী পতির জন্য বড় ব্যাকুলা হইল, অবশেষে পতিভক্তি রাখিবার স্থান ত্রিসংসারে খুঁজিয়া মিলিলনা বলিয়া, মিঃ বামুজি'র রূপরাশিতে তাহা মিশাইয়া দিয়া, পতি-ভক্তিটাকে জীবন্ত রাখিবার উপায় লাভে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিল এবং ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিল। এইরূপ বিবাহ আর দুই একটী হইলে, ভারতের মুক্তিলাভ ঘটিবে—যেখানকার ভারত সেইখানেই লীন হইবেক। হিমালয় পূর্ব্বস্থান সমুদ্রতলে বসিবেন ইত্যাদি। সংস্কারকগণ! ভারতের মুক্তিটা তোমাদেব দ্বারাই হবে।

(৪)

ইউনিভার্শিটীর পাঠ্য পুস্তকগুলিকে ভষ্ম করিয়া বিদ্যুৎ মিশাইয়া এমনি এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বটিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে যে তাহা খাইয়া পরীক্ষা দিলে (পুস্তক পড়া না থাকিলেও) নিশ্চয়ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়। একজন Keymaker অর্থ পুস্তক প্রণেতা এবৎসরে এণ্ট্রান্স, এল, এ, বিএ, কোর্ষের অর্থপুস্তক না লিখিয়া এইরূপ বটিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই বটিকার নাম 'কোর্ষভস্ম বটিকা'। ছাত্রগণ এই বটিকা অনুসন্ধান করিতে কালবিলম্ব করিবেন না। ইহাতে সুবিধা এই, এ বি, না শিখিয়া বিএ পাশ করা যাইবেক। আমাদের দেশের key maker দিগের দীর্ঘজীবন প্রার্থনীয়। তাঁহাদের দ্বারা আর কিছু উপকার না হউক, পাশ্চাত্য সাম্য মন্ত্রের জন্ম সাধনা হইতেছে। মুর্খে ও বিদ্বানে ক্রমশঃ একাকার হইবার সময় তাঁহাবা প্রায় উপস্থিত করিতেছেন। হাড়ি মুচি ব্রাহ্মণ কায়স্থ তো সমান হইতেছে—বিদ্বান মুর্খও সমান হইতেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা! তুমি কিছুকাল পরে ভারত-বর্ষকে একাকার করিবে।

(৫)

একজন ব্রাহ্মণ পথ হাঁটিতে হাঁটিতে ক্লান্ত হইয়া কোন পল্লীতে এক শূদ্রের বহির্বাটিতে উপস্থিত হইলেন। শূদ্র ব্রাহ্মণের পা ধুইবার জন্য একটী ঘটী

জল আনিয়া দিল। ঘটিটী পিতলের—রাং দিয়া ঝালান। ব্রাহ্মণ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে ঘটিটীর প্রায় সর্ব্ব স্থলই রাং দিয়া মেরামৎ করা। ব্রাহ্মণ কৌতুক করিয়া শূদ্রকে জিজ্ঞসিলেন। হাঁহে! এটী তোমার পিতলের ঘটী রাং দিয়া ঝালান, কি রাংএর ঘটী পিতল দিয়া ঝালান?

(৬)

কোন কলেজ-স্কুলে একটী কৃষ্ণকায় পণ্ডিত ছিলেন। পণ্ডিতটী অত্যন্ত কাল। সেই কাল রংটার জন্য পণ্ডিত মহাশয়কে মাঝে মাঝে বড়ই লাঞ্ছিত হইতে হইত। এণ্ট্রান্স ক্লাশে বাঙ্গালা পড়াইতেন। ছাত্রগণ সর্ব্বদাই তাঁকে জ্বালাতন করিত। ছাত্রগণ তাঁহাকে স্কুল হইতে তাড়াইবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিত—কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়ের সুপারিসের জোর থাকায় পণ্ডিত মহাশয় অটল হইয়া থাকিলেন।

একদিন গ্রীষ্মকালে, পণ্ডিত মহাশয় ক্লাশে আসিবার পূর্ব্বে, ছাত্রগণ একটী সাপ লইয়া, পণ্ডিত মহাশয়ের বসিবার চেয়ারের সম্মুখস্থ বইএর ডেস্কে—রাখিয়া দিল। পণ্ডিত মহাশয় ক্লাশে প্রবেশ করিবামাত্র, একটা মুখচাপা হাসির মৃদু মৃদু শব্দ উঠিল। তার পর দুই তিন স্থলে কৃত্রিম কাশী—হাঁচির উৎপাত আরম্ভ হইল। পণ্ডিত মহাশয় চেয়ারে বসিবামাত্র—ছাত্রদিগের সেই অস্ফুট কোলাহল পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। দুই একটি ভাল ছেলে এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল—এখন হাসির তোড়ে আক্রান্ত হইয়া আর থাকিতে পারিল না। ভয়ানক হাসি হাড় মাস ভেদ করিয়া উঠিতেছে দেখিয়া তাহারা মুখ হেঁট করিয়া মুখের ভিতরে চাদর পুরিতে লাগিল। তার পর যখন পণ্ডিত মহাশয় ডেস্ক খুলিবার জন্য হাতখানি বাড়াইলেন, অমনি সেই ব্যাপারের কর্ম্মকর্ত্তা ৩৪টী ছাত্র মুখ চাদরে চাপিয়া পেটের হাসিটাকে ভিতরে চাপিতে চাপিতে ক্লাশের বাহিরে চলিয়া যাইল—সমুদয় ক্লাশে একটা ভীষণ হাসির রোল উঠিল। পণ্ডিত মহাশয় ডেক্স খুলিবামাত্র সাপটা কিল্‌বিল্‌ করিয়া উঠায়, পণ্ডিত মহাশয় "বাবারে" বলিয়া তড়াং করিয়া লাফাইয়া সে স্থান ছাড়িলেন। অমনি সমুদয় গৃহ ছাত্রগণের হাসির উচ্চ কোলাহলে যেন ফাটিবার উপক্রম হইল।

পণ্ডিত মহাশয় রাগে ফুলিতে ফুলিতে তেলে বেগুণে জগার মত, উন্মত্তের ন্যায় আপমান ও জিঘাংসার আক্রমণে অধীর হইয়া কলেজের প্রিন্সিপালের নিকট নালিশ করিবার জন্য মহাবেগে যাত্রা করিলেন।

পণ্ডিত মহাশয় ক্লাস ছাড়িয়া গেলে, ছাত্রদের মধ্যে ধর্ম্মঘট বসিল। তখন সকলেই এক মতাবলম্বী হইয়া মিথ্যার জয়লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হইল। সেই ব্যাপারের মহারথীগণ, সমুদয় ক্লাসে চুপে চুপে যাইয়া যেন বৈদ্যুতিক বলে স্কুলের সমুদয় ছেলেকে এক-মতাবলম্বী করিয়া ফেলিল। কে একজন বুদ্ধিমান ছাত্র, চানক্যের বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, সকলকে শিখাইয়া দিল যে, সাহেব কৈফিয়াৎ চাহিলে আমরা বলিব, "পণ্ডিত মহাশয়ের গ্রীষ্মকালে বায়ুরোগ বাড়ে—সেই বায়ুরোগের জন্য তিনি বিকৃত মস্তিকে সকল স্থলেই সর্প দর্শন করেন। পণ্ডিত মহাশয়ের সাপ—সাপ একটা বাই আছে।" তার পর কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেব, পণ্ডিতমহাশয়ের মুখে ছাত্রদিগের দুর্ব্বহারের ভীষণ বার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া ক্লাশে আসিলেন। তখন ছাত্রগণ বড়ই শিষ্ট শান্তভাবে বই খুলিয়া পড়িতেছে—ক্লাশে যে একটা অতবড় ব্যাপার হইয়াছে তাহা যেন তাহারা অবগতই নহে। সাহেব আসিয়া ক্রোধের সহিত কৈফিয়াৎ চাহিল। ছাত্রগণ সমস্বরে বলিল, ক্লাশে সাপ কেহ দেখে নাই, পণ্ডিত মহাশযের গ্রীষ্মকালে মাথার ব্যারাম বাড়ায়, উনি চারি দিকে সাপ দেখিয়া থাকেন। যখন স্কুলের সকল ছাত্র ঐ কথা বলিল, তখন সাহেব নিরস্ত হইয়া ফিরিলেন। পণ্ডিত মহাশয় পৃথিবীতে মিশিবার উপায় না থাকায় পেটের দায়ে আবার স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

(৭)

গভীর শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বড় রঙ্গরস প্রিয় লোক-ছিলেন। এক সময়ে তিনি লক্ষ্ণৌ গমন করেন। সেখানে তাঁর আগমন বার্ত্তা শ্রবণে অনেক বড় লোক তাঁর সহিত সাক্ষাত করিতে আসিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি দুই খানি ইংরাজি পত্র আনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতে দিলেন। পত্র দুখানি হাতে দিয়া তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন, মহাশয় আপনি তো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মহারথী। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ভাল ইংরাজী শিখে না কেন?

দেখুন একজন এম, এ এই পত্রখানি লিখিয়াছেন ইহাতে কত ইংরাজীর ভুল, আর অন্য পত্রখানি একজন এণ্ট্রান্স পাশ করা ছেলের লেখা। তার চিঠিখানা তো নির্ভুল দেখিতেছেন। এ বিষয়ের একটী ভাল জবাব আপনাকে দিতে হবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন। বাপু! তোমায় একটী গল্প বলি শুন। গল্পটায় তোমার প্রশ্নের মিমাংসা হইবেক। বিদ্যাসাগর মহাশয় আরম্ভ করিলেন :—একটী গুলির আড্ডায় নানা ভাবের কথা চলিতেছিল। একজন পরিশেষে বলিল, আমি একটা অদ্ভুত ব্যাপার বলি শুন। সে বলিল :—আমি এমন একটী কল দেখিয়াছি, তাহাতে আক ও বাছুর বাঁধিয়া ফেলিয়া দিতেছে; আর সেই কলের বাহিরে নানা প্রকারের সন্দেশ বাহির হইতেছে। কলের ভিতরে বাছুর বাড়িয়া দুগ্ধ দান করিতেছে। কলের ভিতরে আক হইতে গুড় হইয়া চিনি প্রস্তুত হইতেছে। পরিশেষে ছানা ও চিনিতে মিশিয়া নানা প্রকারের সন্দেশ বাহির হইতেছে। সন্দেশ নানা প্রকারের হইলেও আস্বাদনে সবই এক প্রকার। সেইরূপ আমরাও ইউনিভার্শিটীরূপ কলে ছাত্র শিক্ষক, টেবিল চেয়ার কেতাব কলমাদি ফেলিয়া দিতেছি, আর নানা প্রকারের উপাধি বিশিষ্ট ছাত্র বাহির হইতেছে; যথা এণ্ট্রান্স, এল এ, বিএ, এম এ প্রভৃতি। আস্বাদন করিয়া দেখিলে পূর্ব্বোক্ত সন্দেশের মত সকলের গুণ সমান।" কথাটী শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলেন। মনে মনে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে, সদুত্তর পাইয়া, ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

(৮)

একব্যক্তি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল মহাশয় আপনার স্কুলে একি প্রকার ব্যবস্থা? এ, বি যে পড়ে তার মাহিনা ৩৲ আবার বি এ যে পড়ে তার মাহিনাও ৩৲, হয় একদিক কমান—না হয় আর দিকে বাড়ান। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বলিয়া উত্তর দিলেন "আমার ব্যবস্থা ঠিকই হইয়াছে। কারণ এক দিকে এ, বি ও অন্য দিকে বি, এ। হরপের উল্টা মাত্র। বিদ্যা উভয় পক্ষেরই সমান।

(৯)

চুম্বন জিনিসটী কি? এই সম্বন্ধে কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অনেক গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, ইহা রাক্ষসত্বের অবশিষ্টাংশ (Remnant of Canibalism)। পূর্ব্বে মানুষে মানুষ খাইত। এখন মানুষ সভ্য হইলেও সে অভ্যাসটা ছাড়িতে না পারায়, মানুষ মানুষের মুখ-চুম্বন করে। কথাটী আমাদের ঠিক বলিয়াই বোধ হয়।

(১০)

চুম্বন জিনিসটী কি? এটী নিরাকার পদার্থ। যদি সাকার হইত, তো মণ্ডা মিঠাই অপেক্ষা ইহার দাম অধিক হইত। তাহা হইলে প্রণয়িণীদিগকে চুম্বন লাভের পর আঁচাইতে হইত। নিরাকার হইয়াই জগতে এত আধিপত্য সাকার হইলে, না জানি, সে আধিপত্যটী কতদূর বাড়িত। উহার উপাদান কি কেহ বলিতে পারেন?

জিনিসটী যাহাই হউক না কেন, উহা যে সভ্যতার পরিচায়ক তাহার আর সন্দেহ নাই—সভ্যতার উন্নতির সহিত উহারও উন্নতি।

(১১)

শৃগাল মরিয়া উকিল হয় এবং মড়া মরিয়া মোকদ্দমার সাক্ষী হয়। সাক্ষী যখন উকিলদিগের জেরার চক্রে পড়ে তখন একথাটী যে ঠিক তাহা সে বুঝিতে পারে। তখন বোধ হয় তার পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতিটা জাগ্রত হয়।

(১২)

লিখিতে লিখিতে চুম্বনের উপাদানটী স্থির করিয়াছি। কি—বলিব? Nothing—অবস্তু। সাংখ্যদর্শনকার বলিয়াছেন অবস্তু হইতে বস্তু সম্ভবেনা, বস্তু হইতে বস্তু। সাংখ্যদর্শনের শেষ কথাটী বড় ঠিক নহে কারণ বস্তু হইতে যে অবস্তুও জন্মায়, তাহার প্রমাণ চুম্বনে পাওয়া যায়। চুম্বনের উৎপত্তিটীর বিষয় অনুধাবন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় কি? দুটী ঠোঁটের আকুঞ্চনে বায়ুর আকর্ষণে একটী সাকার পদার্থের অবলম্বনে চুম্বনের উৎপত্তি হয়। আমরা এই মাত্র জানি। কিন্তু যেটীর উৎপত্তি হইল সেটী কি পদার্থ?

সেটা অবস্তু Nothing ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই Nothingটীর এত আধিপত্য যে বলা যায় না। ইহার বিহনে প্রলয়—জগৎ মারা যায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, Nothing অবস্তু যাহাকে বলি সেটী আমাদের জ্ঞানের অর্দ্ধাংশ। জ্ঞানের একাংশ Something বস্তু, অপরাংশ Nothing অবস্তু। এই চুম্বন যেমন কিছু না হইয়াও প্রাণীকে মোহে মুগ্ধ করিয়াছে, জ্ঞানের অবস্তুত্বটাও সেইরূপ প্রকৃত পদার্থের উপরে আবরণ স্বরূপ পড়িয়া সৎকে অসৎরূপে প্রকাশ করিতেছে।

(১৩)

সাধুরা জগৎকে আত্মবৎ দর্শন করেন। এক সাধু সেইভাবে অধীর হইয়া অর্থের অনাটন বশত এক ধনীর গৃহে প্রবেশ করিয়া, সেখানকার সমুদয় পদার্থকে আপনার বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। পরিশেষে ধনীর একটী বাক্স আপনার বাক্স ভাবিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। কিছু টাকা হস্তগত করিয়া গৃহে ফিরিলেন। তিনি মাঝে মাঝে এইরূপ করিতেন, একবার ধরা পড়িয়া পুলীষে চালান গেলেন। পরে বিচারপতির সম্মুখে দাঁড় করান হইলে বিচারপতি জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি সাধু—আপনি চুরী করিলেন কেন?

সা— আমি আমার জিনিস লইয়াছি। যার লইয়াছি সে যদি আমায় আপনার মত ভাবিত তো আমার এ কষ্ট হইত না। সে অসাধু বলিয়াই আমার কষ্ট।

বি—এখন আপনার ঘরে ও জেল-ঘরে তো কোন পার্থক্য নাই? আপনি আপনার জেলের ঘরে ২ মাসের জন্য যান। সাধুতাটা চৌর্য্যবৃত্তিরই একটী অবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

(১৪)

কোন দয়ালু ধনী ব্যক্তি, কোন দরিদ্রকে ডাকিয়া বলিল, হাঁহে! তোমায় আমি এত দয়া করি, তোমার এত উপকার করি, আর তুমি আমার অনিষ্ট চেষ্টা কর। তোমাকে ডাকিয়া আমি পাইনা। তুমি আমার কাছে আমার দয়ার জন্য কি ঋণী নও? দরিদ্র নির্ভয়ে উত্তর করিল, আমি যেমন আপনার কাছে ঋণী, আপনিও তেমন আমার কাছে ঋণী।

ধনী ব্যক্তি স্তম্ভিত হইয়া বলিল, কৃতঘ্ন! তুই কি বকিতেছিস? দরিদ্র বলিল, কৃতঘ্ন! আমি আছি বলিয়া তোর দয়া বৃত্তির পরিচালনার উপায় পাইয়াছিস! যদি দরিদ্র না থাকিত, দয়ালুদের দয়া কার আশ্রয়ে বলিষ্ঠ হইত। মূর্খ এ পৃথিবীতে কেহ কাহারও কাছে ঋণী নহে। যদি কাহারও কাছে আমরা ঋণী থাকি তো সেই ব্যক্তির কাছে আছি, যিনি দয়া ও দারিদ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন।

সেই দিন হইতে ধনীর অহংকার চূর্ণ হইল—দয়া বাড়িয়া গেল।

